ভারত বিভক্তি ও বাংলাদেশের রাজনীতির ধারা

এ. কে. এম. রফিক উল্লাহ্ চৌধুরী

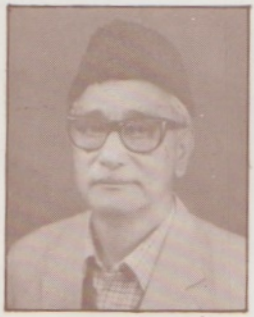

লেখক-পরিচিতি

এ.কে.এম. রফিক উল্লাহ্ চৌধুরী এ শতাব্দীর বিশ দশকের গোড়ার দিকে সন্দ্বীপে একটি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে শুধু একটি বছর সন্দ্বীপের কাঠগড় গোলাম নবী বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের পর চট্টগ্রাম সরকারী মুসলিম হাই স্কুলে ১৯৩৩ সালে ভর্তি হন। তাঁর বাকী ছাত্রজীবন কাটে চট্টগ্রাম সরকারী মুসলিম হাই স্কুল, কোলকাতা সরকারী ইসলামীয়া কলেজ ও কোলকাতা সিটি কলেজে। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় সন্দ্বীপে ত্রাণ কাজের মাধ্যমে তাঁর সামাজিক কাজ শুরু হয়। স্কুল জীবন থেকেই "নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র লীগের" উৎসাহী সদস্য ছিলেন। ১৯৪০ সালের পর থেকে পাকিস্তান আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি মুসলিম লীগের সক্রিয় সদস্য হিসেবে কাজ করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তমদ্দুন মজলিসের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তার সক্রিয় কর্মী হিসেবে কাজ শুরু করেন। ১৯৫৩ সালে খেলাফতে রব্বানী পার্টি প্রতিষ্ঠার পর উক্ত রাজনৈতিক দলে যোগদান করেন। খেলাফতে রব্বানীর চট্টগ্রাম জেলা সম্পাদক, কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম-এর সদস্য ও ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সেক্রেটারী জেনারেল হিসেবে কাজ করেন তিনি। ১৯৭৭ সালে নেজামী ইসলাম, জামায়াতে ইসলামী, P.D.P. ও খেলাফতে রব্বানী পার্টির সমন্বয়ে "ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ" গঠিত হলে তিনি অন্যতম কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭৯ সালে সন্দ্বীপ নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়ে জেনারেল এরশাদের মার্শল ল ঘোষণা পর্যন্ত জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে কাজ করেন। ১৯৮০ সালে "বাংলাদেশ-ইসলামী রাষ্ট্র" সংসদীয় গ্রুপের সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচিত হন। ১৯৮৫ সালে প্রথম উপজেলা নির্বাচনে সন্দ্বীপ উপজেলার চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হন এবং ১৯৮৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উপজেলা চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। বর্তমানে অবশ্য তিনি কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত নন।

তিনি "কোলকাতা সন্দ্বীপ এসোসিয়েশন"-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং চট্টগ্রামস্থ জমিয়াতুল ফালাহ্‌র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। চট্টগ্রাম মুসলিম এডুকেশন সোসাইটির সাথে সুদীর্ঘ ৪৮ বছর পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে জড়িত রয়েছেন তিনি। এখন তিনি বিভিন্ন সামাজিক কাজের সাথে সম্পৃক্ত আছেন।

– প্রকাশক

www.pathagar.com

ভারতবিভক্তি
ও
বাংলাদেশের
রাজনীতির ধারা

এ. কে. এম. রফিকউল্লাহ্ চৌধুরী

BCBS

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম – ঢাকা।

www.pathagar.com

ভারতবিভক্তি
ও
বাংলাদেশের রাজনীতির ধারা
এ. কে. এম. রফিকউল্লাহ্ চৌধুরী

প্রকাশক
অধ্যাপক এন.এম. হাবিব উল্লাহ্
ভারপ্রাপ্ত পরিচালক
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম।
ফোনঃ ২২৭৫২৩

ঢাকা অফিস
১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা। ফোনঃ ৯৫৬৯২০১

প্রকাশকাল
মে, ১৯৯৬

কভার ডিজাইন
খালেদ আহসান

কম্পিউটার কম্পোজ
এ্যাডর্ন
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোনঃ ৬১৬০১০

মুদ্রণ
নিশান প্রিন্টার্স
৫০, সদরঘাট রোড, চট্টগ্রাম।
ফোনঃ ৬১৪৮৬৬

মূল্য ঃ
পঁচাত্তর টাকা
$ 5.00

BHARAT BIBHAKTI O BANGLADESHER RAJNITIR DHARA
By: A.K.M. Rafiqullah Chowdhury.
Published by: Bangladesh Co-operative Book Society Ltd.
Chittagong, Bangladesh.

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার মরহুমা স্ত্রী বিশিষ্ট সমাজসেবিকা ও লেখিকা
(যাঁর এই পর্যন্ত চারটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে)
বেগম জোলেখা খাতুনের স্মৃতির প্রতি
আমার এই সামান্য প্রচেষ্টা
উৎসর্গিত হল।

এ.কে.এম. রফিক উল্লাহ্ চৌধুরী
"চামেলী নিবাস"
৭৯, শহীদ সাইফুদ্দীন খালেদ সড়ক
চট্টগ্রাম।

www.pathagar.com

ভূমিকা

১৯৩৮ সালে নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র লীগের সদস্য হিসেবে ছাত্ররাজনীতির সাথে নিজেকে জড়িত করি। পরবর্তীতে ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে যখন পাকিস্তান প্রস্তাব পাশ হয় তখন পাকিস্তানের পক্ষে প্রচার কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে নিজেকে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত করি। এরপর থেকে দিনের পর দিন আরো গভীরভাবে যেন রাজনীতির সাথে জড়িত হয়ে পড়ি। তবে যতদিন ছাত্র ছিলাম ততদিন রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে সমকালীন রাজনীতির একজন সচেতন কর্মী হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি। সবসময় একটি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রাজনৈতিক ঘটনাগুলোর বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। আমি আমার সারাজীবন দলীয় মনোবৃত্তি নিয়ে রাজনীতি করার চেয়েও মানবকল্যাণের কথা বিবেচনা করে কাজ করাকেই প্রাধান্য দিয়েছি, যার কারণে আমার অনেক রাজনৈতিক বন্ধু বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা সম্পর্কে আমার সাথে ভিন্নমত পোষণ করতেন। প্রায়ই আমার ইচ্ছা হত বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাকে আমার নিজের দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করে জনগণের নিকট প্রচার করতে। অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে এবং দলীয় বন্ধুবান্ধবদের বিরোধিতার ফলে সেদিকে বিশেষ এগুতে পারিনি। অনেক সময় সমাজ ও দেশের পরিবেশের কারণে নিজের চিন্তার প্রচার করার পথেও বাধার সৃষ্টি হয়েছে। সমাজ ও দেশের পরিবেশকে অবহেলা করে কিছু করতে গেলে আমার আসল উদ্দেশ্য সফল হবে না ভেবেই আমাকে নিবৃত্ত থাকতে হয়েছে। নিরুপায় হয়ে তখন সমাজ ও দেশের পরিবেশ পরিবর্তনের আশায় অপেক্ষা করতে হয়েছে। সমাজ যদি আমার কথা শুনতে প্রস্তুত না থাকে তেমনি অবস্থায় কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন বলেই মনে করেছি। আমি বিশ্বাস করতাম, পরিবেশ একদিন না একদিন পরিবর্তিত হবে এবং তখনই আমার কথাগুলো জনগণ মনোযোগসহকারে শুনবে। যেকথা একদিন জনগণ মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয় ঠিক সেকথাই সময়ের ব্যবধানে অতি খাঁটি বলে পরে গ্রহণ করে। তাই সমাজ ও সমাজের পরিবেশের দিকে লক্ষ্য রেখে আমার দেখা রাজনীতির সঠিক ইতিহাস আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার বাসনা নিয়েই এই লেখাটিতে হাত দিয়েছি। আমি বিশ্বাস করি, এখনও সবকথা সঠিকভাবে শোনার মনোবৃত্তি আমাদের

www.pathagar.com

দেশে গড়ে উঠেনি। তাই এলেখাতেও সবকথা বলা সম্ভব হবে না। আশা করি ভবিষ্যতে সেসকল কথা বলার সুযোগ আসবে। প্রসঙ্গতঃ এখানে উল্লেখ্য যে, ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের জন্য এ বইয়ের পরিশিষ্টে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবসহ কায়েদে আজম ও শেরে বাংলা প্রমুখ নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা এবং ১৯৪৬ সালের দিল্লী কনভেনশনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর উত্থাপিত প্রস্তাব সংযোজন করা হলো।

আমাদের অতীত ইতিহাস তুলে ধরতে গিয়ে আমি দেখেছি, এমন অনেক কথা আছে যার সঠিক ব্যাখ্যা দিলে এদেশে এখনও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তাই সেই সকল বিষয়ে আরো কিছুদিন নীরবতা অবলম্বন করা প্রয়োজন মনে করছি। পাকিস্তান আমল ও মুক্তিযুদ্ধের সময়ের সকল কথা সঠিকভাবে বলার সময় এখনো হয়নি বলে আমি মনে করি। তাই আমার এলেখা থেকে ঐ সময়ের অনেক কথাই বাদ দেয়া হয়েছে। তবুও মাঝে মাঝে কিছু কিছু কথা এসে গেছে। ইতিহাসের প্রয়োজনেই সেসকল কথা এসেছে। আমি জানি আমার কিছু কিছু বন্ধু আমার অনেক ব্যাখ্যার সাথে দ্বিমত পোষণ করবেন। বন্ধুদের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ, ঠাণ্ডা মাথায় আমার কথাগুলো একবার নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ভেবে দেখুন। ১৯৭৪ সালে এক বন্ধুকে বলেছিলাম, "আপনারা এখন যে সকল কথা লিখে যাচ্ছেন ইতিহাসে কিন্তু সেসকল কথা স্থান পাবে বলে আমার মনে হয় না। গোপনে কোন্ 'ফেরেশতা' কি লিখে রেখে যাচ্ছেন তাই একদিন ইতিহাসে স্বীকৃতি পাবে বলে আমার বিশ্বাস। অতীতে তাই হয়েছে, ভবিষ্যতেও তারই পুনরাবৃত্তি হবে।' ইতিহাসকে ধামাচাপা দেয়া যায় না। সাময়িকভাবে বিকৃত করা গেলেও ইতিহাসের সত্যকে কখনো পাল্টানো যায় না। কালুরঘাটে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েই যেমনি জেনারেল জিয়া মুক্তিযুদ্ধের প্রধান নেতৃত্বের দাবীদার হতে পারেন না, ঠিক তেমনিভাবে কালুরঘাট থেকে রেডিওতে দেয়া জেনারেল জিয়ার ভাষণকেও ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা যাবে না। জেনারেল জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার কারণে স্বাধীনতা আন্দোলনে শেখ মুজিবের অবদানকে সামান্যতম খাটো করে দেখার অবকাশ আছে বলে আমি মনে করি না। তবুও স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে এত বিতর্ক কেন?

আমাদের অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু

www.pathagar.com

লিখার জন্য অনুজপ্রতিম অধ্যাপক কাযী আযিয উদ্দিন আহমদ ও কবি জহুর-উশ্-শহীদ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। আমার এই লেখাটির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সম্বন্ধে এই উভয় সহযোগী নানা পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁদের পরামর্শ আমার এই লেখার গুণগত মানের ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। বিশেষ করে প্রীতিভাজন কবি জহুর-উশ্-শহীদ পাণ্ডুলিপি তৈরীর ব্যাপারে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। তাঁদের উভয়ের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

এই বইটি প্রকাশের ব্যাপারে বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটির পরিচালক বন্ধুবর অধ্যাপক আ. ন. ম. হাবিব উল্লাহ্ প্রথমে আমার কাছে প্রস্তাব দেন। পরবর্তীতে বুক সোসাইটির সহ-সভাপতি বন্ধুবর মুনাওয়ার আহমদ ও পরিচালক বন্ধুবর মুহম্মদ নূরউল্লাহ সক্রিয় সহযোগিতা দেয়ার কারণে বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি থেকে এই বইটি প্রকাশিত হওয়ায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি বুক সোসাইটির পরিচালনা পরিষদের সকল সদস্যকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই।

এ. কে. এম. রফিক উল্লাহ্ চৌধুরী
৭৯, শহীদ সাইফুদ্দীন খালেদ সড়ক
চট্টগ্রাম।

তারিখঃ
৪ঠা মে, ১৯৯৬

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ কথা

কোন দেশের পরিচিতি কিংবা জাতিসত্তা হঠাৎ করে একদিনে গড়ে উঠে না। ইতিহাসের প্রলম্বিত ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে এক একটি জাতিসত্তার পরিচিতি বাস্তব রূপ লাভ করে। সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং দৈনন্দিন আচার আচরণ ও বিনোদন, শিক্ষা এবং ধর্মের আদর্শিক চৈতন্যগুলো ইতিহাসের উপাত্ত হিসেবে কাজ করে। আমাদের জাতিসত্তার ইতিহাস হাজার বছরের পুরনো। আর এটাই আমাদের বাংলাদেশী জনগোষ্ঠীর সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনে কাজ করেছে। ১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধে ষড়যন্ত্রের শিকার বাংলার স্বাধীনচেতা নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর থেকে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তার স্বাধীন ঐতিহ্য নিয়ে বেঁচে থাকার জন্যে উপনিবেশবাদী ইংরেজ ও তার এদেশীয় এজেন্টদের বিরুদ্ধে প্রায় পৌনে দু'শ বছর জেহাদ করেছে। তা কখনও-বা বিভিন্ন প্রতিকূলতার জন্যে স্তিমিত হয়েছে সাময়িকভাবে, কিন্তু সংগ্রাম থেমে থাকেনি। আজকের স্বাধীন বাংলাদেশের সার্বভৌম অস্তিত্বও এই সংগ্রামেরই ফসল।

সব দেশেই সকল যুগে একটি কুচক্রীদল স্বার্থ সাধনের লক্ষ্যে সর্বসাধারণকে ইতিহাস ভুলিয়ে দেয়ার জন্যে এবং জাতিসত্তা সম্পর্কে অজ্ঞ করে তোলার অসৎ উদ্দেশ্যে তৎপর থেকেছে। আমাদের বাংলাদেশও তা থেকে ভিন্নতর কিছু নয়। এখানেও ইতিহাসবিকৃতি ঘটানো হয়েছে এবং এই বিকৃতিকে বলা হয়েছে ইতিহাস। এদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আত্মপরিচিতি থেকে দূরে রাখার অশুভ উদ্দেশ্যে ইতিহাসের সত্যকে গোপন করা হয়েছে। এদেশের ইতিহাস, সাহিত্য ও শিল্পকর্ম তথা সার্বিক জীবনপ্রবাহকে এমনভাবে সাজানোর প্রচেষ্টা চলেছে যেন সত্তর দশকের আগে এজাতির কোন ইতিহাস ছিল না, ছিল না কোন ঐতিহ্য। কিন্তু ইতিহাসের সত্যকে কেউ কোনদিন গোপন রাখতে পারে না। সত্য একদিন না একদিন উদ্ভাসিত হয়েই পড়ে। যেমন মধ্যযুগে উপমহাদেশের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক 'ফিরিশতা' সত্য উদঘাটনে নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তেমনি বর্তমানেও আমরা সেই সত্যান্বেষী ঐতিহাসিকের প্রত্যাশা করছি।

'ভারতবিভক্তি ও বাংলাদেশের রাজনীতির ধারা' বইটিতে ইতিহাসের বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সমাজকর্মী এ. কে.

www.pathagar.com

এম. রফিকউল্লাহ্ চৌধুরী তাঁর এই বইটিতে সেসব সত্য উদঘাটনের প্রয়াস পেয়েছেন যেসব বিষয়ে আমাদের এ প্রজন্ম মোটেই ওয়াকিফহাল নয়।

তাঁর এই বইটিতে ভৌগোলিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে উপমহাদেশে বিভিন্ন জাতির বসতি স্থাপন, বিভিন্ন সংস্কৃতি, ধর্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতির বিকাশ সম্পর্কে মৌল আলোচনা করা হয়েছে। উপমহাদেশের বিভক্তি ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের অনেক তথ্য আন্তরিকতার সাথে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আমরা দু'দুবার স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছি— একবার ১৯৪৭ সালে, আরেকবার ১৯৭১ সালে। লেখক এসব ব্যাপারে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন; আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন ভারতবিভক্তি ও বঙ্গবিভক্তির (একবার ১৯০৫ সালে, আরেক বার ১৯৪৭ সালে) দীর্ঘ ইতিহাস ও রহস্যাবৃত তথ্যাবলী। প্রসঙ্গক্রমে সীমানা নির্ধারণ কমিটির তৎপরতা, র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের প্রস্তাব ও তা বাস্তবায়নের মধ্যে যে ফাঁক রয়ে গেছে সেসম্পর্কিত তথ্য, ক্যাবিনেট মিশনের তৎপরতা, লাহোর প্রস্তাবের স্টেটস কেটে কেন স্টেট করা হল এবং সেটা কে উত্থাপন করেছিলেন সেসব বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তিনি বইতে দিয়েছেন। ভারতবিভক্তির যৌক্তিক সীমারেখা প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার পেছনে এবং বর্তমানে বাংলাদেশের নাজুক সীমান্ত, সর্বোপরি ভারত খণ্ডিত হওয়ার পেছনে কংগ্রেস ও বৃটিশ সরকারের অশুভ আঁতাতের কথা অত্যন্ত স্বচ্ছ করে তুলে ধরেছেন তিনি। বেশ আন্তরিকতার সাথে এ বইটিতে দ্বিজাতিতত্ত্ব যে একটি বাস্তবতা এবং এখনো তা টিকে আছে সেসত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। উপমহাদেশের খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ, হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মত মহান ব্যক্তিত্ব ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতার জন্ম না হলে যে এদেশের মুসলমানদের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াত তাও আন্তরিকতার সাথেই তাঁর লেখায় প্রকাশ করেছেন।

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালে কেন ভারতে না গিয়ে পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে ধরা দিলেন, কেনই-বা তিনি জাতীয়তাবাদী হয়েও শেষ পর্যন্ত ষড়যন্ত্রকারীদের আওতার বাইরে যেতে পারেননি কিংবা ছাত্রলীগ পুনর্গঠন এবং পরবর্তীতে বাকশালই-বা কেন গঠন করেছিলেন সেই সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য দেবার প্রচেষ্টা এতে পরিলক্ষিত হয়েছে। আমার বিশ্বাস, বিভিন্ন প্রসঙ্গে লেখকের মতামতের সাথে অনেকেই ভিন্নমত পোষণ করবেন এবং এটাই স্বাভাবিক। আর

www.pathagar.com

এজন্যেই আমি আশাবাদী, লেখকের এই বইটি পাঠক সমাজে আগ্রহ সৃষ্টি করবে।

লেখক তাঁর বইতে শেষ দিকে ইসলামী আন্দোলনের বাস্তবায়নের জন্যে ইসলামী দলগুলোর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার উপর জোর দিয়েছেন; বিশেষ করে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ইসলামী আন্দোলনের ব্যর্থতা, ফিলিস্তিনের বর্তমান রাজনীতি ও সংগ্রাম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ আজ ঐতিহাসিক কারণেই এই বইটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে এদেশের প্রকাশনার ইতিহাসে বুক সোসাইটি একটি পরিচিত নাম। বর্তমানে এ সমিতি এদেশের পাঠক শ্রেণীকে মান ও রুচিসম্মত সবধরণের সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি আগ্রহী করে তোলার লক্ষ্যে পুস্তক প্রকাশনার এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। প্রতিষ্ঠিত দামী-নামী লেখকের পাশাপাশি নতুন লেখকদেরও স্থান করে দেয়ার উদার নীতি সংস্থার পথযাত্রার পাথেয়।

প্রসঙ্গতঃ সোসাইটির ইতিহাসও এখানে তুলে ধরা একান্ত প্রয়োজন বলে আমি অনুভব করছি। তৎকালীন বিভাগীয় কমিশনার বিশিষ্ট সমাজসেবক এন.এম. খানের উদ্যোগে ১৯৪৯ সালে সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁরই সাথে হাল ধরার জন্যে এগিয়ে এসেছিলেন সোসাইটির সেক্রেটারী হিসাবে তদানীন্তন এস.ডি.ও এম.এ. আজিজ। তাঁদের এই অবদান আল্লাহ্ নিশ্চয় কবুল করবেন।

বিভাগীয় কমিশনার এন.এম. খান বিভিন্ন কাজে তাঁর নিকট আগত ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে সোসাইটির জন্যে চাঁদা সংগ্রহ করতেন এবং তাঁদেরকে শেয়ার কেনার জন্যে উদ্বুদ্ধ করতেন। সোসাইটিকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাবার লক্ষ্যে তিনি এমনিভাবে আন্তরিক ও অকৃত্রিম প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তিনি বহু বছর সোসাইটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন এবং সমিতির পরিচালনা সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সোসাইটি একটি অনন্য সমবায় সমিতি হিসেবে সুনাম অর্জন করে এবং চট্টগ্রামের প্রধান অফিস ছাড়াও ঢাকা, করাচী, সিলেট, রাজশাহী ইত্যাদি স্থানে শাখা সম্প্রসারণ করে।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয় সোসাইটিকে। বুক সোসাইটি প্রেসের কিছু সংখ্যক কর্মচারী

www.pathagar.com

নিজেরাই এক সময় সোসাইটির পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু অদক্ষ পরিচালনা এবং সোসাইটির প্রতি আন্তরিকতা না থাকা হেতু এক পর্যায়ে সোসাইটি পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে ঘোষিত হয়।

ইতিমধ্যে শেয়ার হোল্ডারদের নির্বাচিত কমিটির হাতে এই সমিতির ব্যবস্থাপনার কাজ শুরু হলেও কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটিকে নানা প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। সমবায় মন্ত্রণালয় ও সমবায় বিভাগ ১৯৮২ থেকে এডহক কমিটির মাধ্যমে প্রতিকূল অবস্থা কাটিয়ে উঠার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। ১৯৮৮ সনে সর্বপ্রথম সরাসরিভাবে শেয়ার হোল্ডারদের ভোটে বর্তমান কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি কার্য্যভার গ্রহণের পর চট্টগ্রাম জুবিলী রোডে নিয়াজ মনজিলের দোতলায় ৭৫০০ বর্গফুট নতুন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ঢাকার ১২৫ মতিঝিলস্থ বুক সোসাইটি বিল্ডিং-এ ১৯৩০ বর্গফুট নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে ৬টি নতুন কক্ষ বাড়ানো হয়েছে। চট্টগ্রামে দোতলায় তৈরী করা হয়েছে ৭৫০০ বর্গফুটের ২৭টি নতুন দোকান।

সোসাইটির ভাড়াটিয়াদের কাছ থেকে অনেক প্রতিবন্ধকতা এসেছে; বিশেষ করে সিগনেট প্রেস লিমিটেডের কাছ থেকে। ভাড়ার ক্ষেত্রে সোসাইটি সিগনেট প্রেস থেকে প্রচুর ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে এক সময় নিয়মবহির্ভূতভাবে দৈনিক পূর্বকোণ পত্রিকা বের করে সমস্যাকে জটিলতর করে তোলা হয়। সোসাইটি- ভবনের সামনের চত্বরে যেখানে সোসাইটির একটি পেট্রোল পাম্প ছিল সেখানে বর্তমানে তিন তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

সোসাইটির যেসব দোকান রয়েছে সেগুলোর থেকে নামমাত্র ভাড়া আদায় হয়। যে বৃহৎ ও সুন্দর একটি বইয়ের দোকান চট্টগ্রামে ছিল তা বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার জন্যে তার সঠিক অবয়ব রক্ষা করতে পারেনি। তবুও যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সোসাইটির যাত্রা শুরু হয়েছিল সেসম্পর্কেও কিছু বলা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। সমিতির সদস্যদের কল্যাণ ছাড়াও সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল পুস্তক প্রকাশনার কাজ করে যাওয়া। ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ২২ বছরে সোসাইটি সর্বমোট ২০টি বই প্রকাশ করেছিল। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ১৯৭২-১৯৮৫ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে পুস্তক প্রকাশনা বন্ধ ছিল। নির্বাচিত কমিটি ভার গ্রহণের পর এপর্যন্ত প্রায় ৩৫ খানি নতুন বই এবং ৫ খানি পুনর্মুদ্রিত বই প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

তন্মধ্যে সম্প্রতি প্রকাশিত দি রেনেসাঁ অব ইসলাম, ফেমিলি ভ্যালুস, রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস, বার্নাবাসের বাইবেল, মালটি ফ্লেকস থট্‌স, আবাবিলের কবলে আবরাহা উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া আরো বেশ কয়েকটি বই মুদ্রণের জন্য বিভিন্ন প্রেসে রয়েছে।

সোসাইটির লীজ সম্পর্কিত সংকটে জমি বেহাত হওয়ার আশংকা, বই ব্যবসা পরিচালনার জন্যে নৈতিকতাসম্পন্ন কর্মচারীর অভাব, বই চুরি ইত্যাদি মূল্যবোধের অবক্ষয়জনিত কারণও ছিল অত্যন্ত প্রকট। তবে প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ও লেখক এ. জেড. এম. শামসুল আলমের নেতৃত্বে বর্তমান কমিটি অনেকদিনের বকেয়া পূর্বালী ব্যাংকের পাওনা আদায়, ইনকাম ট্যাক্স ইত্যাদি পরিশোধের মাধ্যমে অতীতের সকল ত্রুটি সংশোধন ও বিশৃংখলা দূরীকরণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, সাথে সাথে পুস্তক প্রকাশনা ও বই ব্যবসার সুষ্ঠু উদ্যোগ গ্রহণেরও প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। আল্লাহ আমাদেরকে এই মহৎ প্রচেষ্টায় কামিয়াব করুন।

পরিশেষে এ.কে.এম. রফিকউল্লাহ চৌধুরীর বই 'ভারতবিভক্তি ও বাংলাদেশের রাজনীতির ধারা' বইটির প্রকাশনা সম্পর্কেও কিছু বলা প্রয়োজন। কয়েক মাস আগে আমরা বইটির কাজ শুরু করি। ১৯৯৫ সনের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে লেখক তাঁর বইয়ের কাজ শেষ করেন। পরবর্তীতে দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক সহিংসতা, বোমাবাজি, উপর্যুপরি হরতাল, অবরোধ এবং লাগাতার অসহযোগ ইত্যাদি অরাজক ও বিশৃংখল পরিস্থিতির কারণে প্রকাশনার কাজ বিলম্বিত হয়। কামনা করি আমাদের সহৃদয় পাঠকবর্গ এসব অসুবিধার কথা বিবেচনা করবেন।

আশা করি দেশের সচেতন পাঠকবৃন্দ আমাদের প্রকাশনার উদ্যোগকে স্বাগত জানাবেন। আল্লাহ আমাদের এই উদ্যোগে সাফল্য দান করুন। আমিন!

মুনাওয়ার আহমদ
ভাইস চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম ও ঢাকা।

চট্টগ্রাম
তারিখঃ ৪ঠা মে, ১৯৯৬

www.pathagar.com

পূর্বকথা

ভারতবর্ষ এশিয়ার অন্যান্য অংশ থেকে বিশাল হিমালয় ও হিন্দুকুশ পর্বতমালা এবং এদুটো পর্বতমালার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা দ্বারা বিচ্ছিন্ন একটি ভূখণ্ড। এই ভূখণ্ডে রয়েছে বিস্তীর্ণ সমতলভূমি ও অনেক নদ-নদী। এই নদ-নদী দ্বারা বিধৌত সমতলভূমি প্রাচীনকাল থেকে বিশ্বের অন্যতম উর্বর ভূমি হিসেবে পরিচিত। ভূমির উর্বরতার মূল উৎস হল বিভিন্ন পর্বত থেকে প্রবাহিত নদ-নদী। এই ভূখণ্ডের নদ-নদীগুলো এই দেশের জনগণের প্রতি সৃষ্টিকর্তার অপার করুণার দান।

ভারতবর্ষ প্রাচীনকালে এক শ্রেণীর অসভ্য আদিবাসীর বাসভূমি ছিল। এই আদিবাসীরা বিভিন্ন অঞ্চলে দলবদ্ধভাবে বাস করত। তারা তাদের গণ্ডীর বাইরের বিশ্ব সম্বন্ধে কোন খবরই রাখত না। এই আদিবাসীদের এক গোষ্ঠীর সাথে অন্য গোষ্ঠীর কোন সম্পর্কও ছিল না। পরবর্তীতে দ্রাবিড় নামে পরিচিত এক অর্ধসভ্য জাতি এই ভারতবর্ষে বসবাস শুরু করে। তারা ধীরে ধীরে ভারতের বিশাল সমভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের আবির্ভাবের ফলে আদিবাসীরা ক্রমে বিভিন্ন পাহাড়ী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। বিভিন্ন নদ-নদীর অববাহিকায় দ্রাবিড় জাতি তাদের বসবাস গড়ে তোলে। তারা নিজেদের জীবিকার জন্য কৃষিকাজের উপরই নির্ভর করত। এর পরবর্তী পর্যায়ে ভারতের উর্বর ভূমির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইউরোপ ও মধ্যএশিয়া থেকে তৎকালীন বিশ্বের সভ্য ও উন্নত মানবগোষ্ঠী উত্তর পশ্চিম দিক দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। এই মানবগোষ্ঠী আর্য বংশেরই একটি শাখা ছিল। আর্যরা ভারতে এসে পঞ্চনদের অববাহিকায় প্রথম দলবদ্ধভাবে বসবাস শুরু করে। স্থানীয় দ্রাবিড়দের সাথে নিয়ে তারা এক উন্নত জীবন যাপনের নতুন পদ্ধতি গড়ে তোলে। তারা সমাজ বিনির্মাণে এক বর্ণপ্রথার আশ্রয় গ্রহণ করে। সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে যাঁরা ধর্মপ্রচারে ব্যস্ত থাকতেন তাঁদেরকে ব্রাহ্মণ শ্রেণীর লোক, যাঁরা সমাজের আইন-শৃঙ্খলা, জনগণের নিরাপত্তা ও সমাজের শাসন-ব্যবস্থা দেখা শোনা করতেন তাঁদেরকে ক্ষত্রিয়, গোটা সমাজের অন্নসংস্থানের জন্য কৃষিকাজে যাঁরা ব্যস্ত থাকতেন এবং গোটা সমাজকে সভ্যজাতি হিসেবে গড়ে তোলার সহায়তায় ব্যস্ত থাকতেন তাঁদেরকে

www.pathagar.com

বৈশ্য বলে আখ্যায়িত করা হত। এ ছাড়াও আরো একটি শ্রেণী ছিল তাদেরকে বলা হত শুদ্র। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা ছিলেন আর্য এবং শুদ্ররা ছিল মূলতঃ দ্রাবিড় আর বৈশ্যরা ছিল আদিবাসী। এই বর্ণপ্রথার মাধ্যমে ব্রাহ্মণরা হলেন সমাজের গুরু এবং ক্ষত্রিয়রা হলেন সমাজের শাসক শ্রেণী। সংখ্যায় অত্যন্ত নগণ্য হলেও এঁরাই সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। ক্ষত্রিয়রা সবসময় ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধা করতেন এবং উপদেষ্টা হিসেবে মেনে চলতেন। সমাজে শুদ্রদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত নগণ্য। বৈশ্যদেরও বলতে গেলে উচ্চ শ্রেণীর সেবা করা ছাড়া কোন ভূমিকাই ছিল না। সেই সময়ে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভারতে একশ্রেণীর সুসভ্য সমাজ গড়ে উঠে। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে কিছু কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে ছোট ছোট রাজ্য গড়ে তোলে। এমনিভাবে ভারতে বহু ক্ষুদ্র রাজ্যের সৃষ্টি হয়। মাঝে মাঝে কিছু কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি আশে–পাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করে নিজেদের রাজ্যের পরিধি বৃদ্ধি করে। প্রাচীন ভারতে এভাবে কিছু কিছু সাম্রাজ্যেরও সৃষ্টি হয়েছিল। প্রভাবশালী ব্যক্তির অভাবে আবার মাঝে মাঝে ঐসব সাম্রাজ্য ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সৃষ্টি হত। এভাবেই প্রাচীনভারতে ভাঙ্গা-গড়ার মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা চলে আসছিল।

সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের আবির্ভাবের ফলে জনজীবনে যে বিরাট বিপ্লব সাধিত হয় ধীরে ধীরে তার প্রভাব পার্শ্ববর্তী ইরান ও মধ্যএশিয়ার দেশসমূহে ছড়িয়ে পড়ে। নবম শতাব্দীতে মুসলমানরা ধীরে দীরে ভারতের উত্তরপূর্ব দিক দিয়ে প্রবেশ করতে শুরু করে। তখনকার ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসকদের সাথে মুসলমানদের সংঘাতের সৃষ্টি হয়। এসব যুদ্ধে মুসলমানদের কাছে একের পর এক হিন্দু শাসকদের পরাজয়ের ফলে ভারতে মুসলিম শাসনের ভিত গড়ে উঠতে শুরু করে। নতুন নতুন রাজ্য জয় করে তারা সেসব অঞ্চলে বসবাসের প্রক্রিয়া শুরু করলেও স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে সংঘাতের পথ পরিহার করে মৈত্রীর হাত বাড়িয়ে দেয়। স্থানীয় অধিবাসীদেরকে তারা আপন করে নেয়ার চেষ্টায় ব্রতী হয়। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা পূর্বের শাসকদের চেয়েও মুসলমান শাসকদের নিকট থেকে উন্নততর ব্যবহার পেতে থাকে। ফলে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে শুরু করে। বর্ণপ্রথার কারণে হিন্দু থাকা অবস্থায় পূর্বের শাসক শ্রেণী থেকে যে ব্যবহার পেত

www.pathagar.com

মুসলমান হওয়ার পর তারা মুসলিম শাসক শ্রেণীর হাত থেকে তার চাইতেও অনেক উন্নততর ব্যবহার পেতে থাকে। ধীরে ধীরে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সমাজের কাছে নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হয়। ইসলামের আগমনের পর উচ্চশ্রেণীর কিছু কিছু চিন্তাশীল হিন্দুর মধ্যেও চিন্তাধারার বেশ কিছু পরিবর্তন দেখা দেয় যার ফলে উচ্চ শ্রেণীর কিছু কিছু হিন্দুও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার কারণে সমাজে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। মুসলমান শাসকেরা বহিরাগত হলেও এদেশে বসবাস করে তারা এ দেশকেই নিজেদের দেশ হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। তারা এদেশের সম্পদ বাইরে কোথাও না নিয়ে এদেশেই ব্যবহার করতে শুরু করে। ফলে ভারতবর্ষ ক্রমেই সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মুসলমানরা সারা ভারতে তাদের নিজস্ব এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। মুসলমানরা সুদীর্ঘকাল ভারত শাসন করেছে। ফলে ভারতে মুসলিম সভ্যতার চরম বিকাশ সাধিত হয়। বস্তুতঃ মুসলমানদের শাসনামলেই ভারত বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধিশালী দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ভারতের সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইউরোপ থেকে বিভিন্ন জাতি ভারতে আগমন করতে শুরু করে। এসব ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে ওলন্দাজ,ফরাসী ও বৃটিশরাই উল্লেখযোগ্য। এদিকে মুসলিম শাসকদের মধ্যে সর্বশেষ প্রভাবশালী সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে উপযুক্ত শাসকের অভাবে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন আঞ্চলিক শাসকরা নিজেদের শাসন এলাকাকে স্বাধীন রাজ্য হিসেবে ঘোষণা দিতে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে তখন মোগল সাম্রাজ্য বহু অংশে বিভক্ত হয়ে অনেক স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি হয়। মোগল সাম্রাজ্যের এই বিভক্তির ফলে কেন্দ্রীয় শাসন এক প্রকার ভেঙ্গেই পড়েছিল। বৃটিশ বেনিয়ারা এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে। তারা নিজেদের নিরাপত্তার নামে এক সেনাবাহিনী গড়ে তোলে। দেশের বিভিন্ন খন্ড খন্ড রাজ্যে শাসকদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও কোন্দলকে তারা কাজে লাগায়। তারা বিভিন্ন দল–উপদলকে সাহায্য দেয়ার মাধ্যমে ধীরে ধীরে নিজেদের শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে শুরু করে। এমনি এক অন্তর্দ্বন্দ্ব, কোন্দল এবং ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্রের সুযোগ নিয়ে ১৭৫৭ সালে নওয়াব সিরাজউদ্দৌলার বিশ্বাসঘাতক সিপাহ্সালার মীর জাফরের

www.pathagar.com

সাথে ষড়যন্ত্র করে বৃটিশ বেনিয়ারা পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করে এবং মীর জাফরকে সিংহাসনে বসায়। এর অল্প কিছুদিন পরে মীর জাফরের জামাতা মীর কাসিমকে তারা নওয়াব হিসেবে ঘোষণা দেয়। কিন্তু স্বাধীনচেতা মীর কাসিমের সাথে সংঘাতের কারণে মীর কাসিমকে সিংহাসনচ্যুত করে বৃটিশ বেনিয়ারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে নেয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তৎকালীন বাংলার হিন্দু রাজা, মহারাজা ও প্রভাবশালী ব্যবসায়ীরা বৃটিশদেরকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিল। হিন্দুদের সাহায্য ছাড়া বৃটিশরা তখনকার বাংলার শাসন-ক্ষমতা নিজেদের কব্জায় আনার কথা চিন্তাও করতে পারত না। দু'চারজন দেশপ্রেমিক হিন্দু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সিরাজকে মনে প্রাণে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় এত নগণ্য ছিলেন যে, তাঁদের সাহায্য কোন কাজেই আসেনি।

বাংলা দখলের পর থেকে বৃটিশরা ধীরে ধীরে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোতে শাসকদের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়াতে থাকে। তারা ধীরে ধীরে এক শক্তিশালী সেনাবাহিনীও গড়ে তোলে। তাদের শক্তিশালী সেনাবাহিনীর ভয়ে বিভিন্ন রাজ্যের দুর্বল শাসকেরা তাদের নিকট নতি স্বীকার করতে থাকেন। বাংলার সিরাজের পরে দাক্ষিণাত্যে একমাত্র টিপু সুলতানের কাছ থেকেই বৃটিশরা প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়। টিপুর বিরুদ্ধে বৃটিশরা হায়দরাবাদের নওয়াব ও মারাঠা পেশোয়াকে অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে ব্যবহার করেছিল। টিপুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করার সময় হায়দরাবাদের নওয়াব ও মুসলিমবিদ্বেষী মারাঠা পেশোয়াকে বৃটিশরা যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল টিপুর পরাজয়ের পর তারা কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতির কোনটাই রক্ষা করেনি, যার ফলে পরবর্তীতে তাঁরাও বৃটিশের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হন। বৃটিশরা তাদের এধরণের ষড়যন্ত্রের নীলনকশা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সারা ভারতের শাসক হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে। এদিকে ভারতীয় মুসলমানেরা নিজেদের স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার জন্য সংগ্রাম করতে শুরু করে। ১৮৫৭ সালে এর চূড়ান্ত বিস্ফোরণ ঘটে। তখন সারাভারতে সিপাহী বিদ্রোহের মাধ্যমে বৃটিশদেরকে এদেশ থেকে তাড়াবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এই সিপাহী বিদ্রোহের সময় ভারতীয় হিন্দুদের এক বিরাট অংশ বৃটিশদের সমর্থন দান করে। হিন্দুদের এই

www.pathagar.com

সমর্থনের কারণে সিপাহী বিপ্লব কার্যতঃ বিফল হয়ে যায়। সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তীতে বৃটিশ বেনিয়াদের কাছ থেকে ভারতের শাসন ক্ষমতা বৃটিশ সরকার নিজ হাতে গ্রহণ করেন।

সিপাহী বিদ্রোহের পরে মুসলমানদের উপর বৃটিশদের অত্যাচার এক চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায়। মুসলমানদেরকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে হিন্দুদেরকে প্রচুর সুযোগ সুবিধা দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে বৃটিশ সরকার ক্রমেই সক্রিয় হয়ে উঠেন। বৃটিশের আগমনকে ভারতীয় মুসলমানেরা দেখেছে নিজেদের স্বাধীনতা হরণের দৃষ্টি থেকে। আর হিন্দুরা দেখেছে প্রভু বদলের দৃষ্টি থেকে। হিন্দুরা বৃটিশের সাহায্য নিয়ে কি করে মুসলমানদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া যায় তারই চেষ্টায় ছিল। তৎকালীন মুসলিম নেতৃবৃন্দও তাঁদের সংগ্রামে ছিলেন অবিচল। তাঁরা এতসব চক্রান্তেও দমে যাননি। সংগ্রামে আন্তরিক মুসলিম নেতারা ছাড়ার পাত্র ছিলেন না। তাঁরা নিজেদেরকে সংঘবদ্ধ করে কিভাবে আবার স্বাধীন জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়ানো যায় তারই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এমনি অবস্থায় ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমানকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজেদের শাসন কিভাবে দীর্ঘস্থায়ী করা যায় বৃটিশরা তারই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। তারা যদিও হিন্দুদেরকে সকল সুযোগ সুবিধা দানে ছিল উদারহস্ত, তবুও নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার লক্ষ্যে মুসলমানদের কিছু কিছু দাবীও মেনে নিত। এমনি করে ভারতের হিন্দু-মুসলিম উভয় জাতিকেই তারা পরোক্ষভাবে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। বিশ্ব রাজনীতির কারণে যখন বৃটিশরা দেখল যে, একদিন না একদিন তাদেরকে এদেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে তখন তারা ভারত ছেড়ে যাওয়ার পরও কি করে ভারতে তাদের স্বার্থ রক্ষা করা যাবে সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে থাকে। ইতিহাসের এই প্রেক্ষাপটেই আমাদের পরবর্তী আলোচনার মূল্যায়ন করতে হবে।

ভারত বিভক্তির গোড়ার কথা

এই উপমহাদেশীয় ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, অবিভক্ত ভারতে মুসলমানেরা তাদের স্বকীয় জীবনাদর্শকে ঠিক রেখেই যাতে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখে

www.pathagar.com

চলতে পারে তদুদ্দেশ্যে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী হিন্দুদের সাথে একটা বোঝাপড়া করতে বহুভাবে চেষ্টা করেছে। এব্যাপারে সাফল্যের আশা নিয়ে মুসলমানেরা ভারতীয় কংগ্রেসের সাথে মিলে মিশে খেলাফত আন্দোলনও করেছে, এমনকি কংগ্রেসের মূল নেতা মহাত্মা এম. কে. গান্ধীর হাতে খেলাফত আন্দোলনের নেতৃত্বও তারা ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ হিন্দু নেতাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় জোরালো সমর্থন না পাওয়ার কারণে খেলাফত আন্দোলন কার্যতঃ বিফল হয়ে যায়, যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তীকালে আলীভ্রাতৃদ্বয় (মাওলানা শওকত আলী ও মাওলানা মোহাম্মদ আলী) কংগ্রেস ছেড়ে দেন। এর পরেও কিন্তু হিন্দুনেতৃত্বের সাথে বোঝাপড়ার ব্যাপারে মুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রয়াস অব্যাহত ছিল।

হিন্দু নেতারা তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সমস্ত ভারতবর্ষকে স্বকীয় চিন্তাধারায় ও নিজস্ব পদ্ধতিতে চালাবার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার প্রয়াস পান। কংগ্রেস নিজেদেরকে ভারতের সকল ধর্মাবলম্বীর প্রতিষ্ঠান বলে দাবী করত, যদিও কংগ্রেস ছিল মূলতঃ ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনগণেরই প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন। বস্তুতঃ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যদি উপমহাদেশের মুসলমানদের অস্তিত্বের দাবীর প্রতি একটুও সহানুভূতিশীল হতেন তা হলে ভারতের ইতিহাস ভিন্নভাবে লিখিত হত। কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বে তখন ভারতে হিন্দু–মুসলমান মিলনের প্রচেষ্টা চলছিল। তাঁকে হিন্দু–মুসলমান ঐক্যের অগ্রদূত আখ্যাও দেয়া হয়েছিল। তাঁর এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে তিনি মুসলমানদের পক্ষ থেকে চৌদ্দ দফা দাবী পেশ করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পন্ডিত মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস যখন নেহেরু রিপোর্টের মাধ্যমে সেই চৌদ্দ দফা দাবী নাকচ করে দিল তখন মুসলমানেরা হিন্দুদের সাথে আপোষের ব্যাপারে অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়ল। এমন একটি পরিস্থিতিতেই ১৯৩০ সালে ভারতীয় মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে আল্লামা ডকটর ইকবাল ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশের মুসলিমপ্রধান অঞ্চলকে নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করেন। সভাপতির ভাষণে মুসলিমপ্রধান অঞ্চলকে নিয়ে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব থাকলেও মুসলিম লীগ কাউন্সিল কিন্তু তখন এধরণের কোন প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। এতে বোঝা যায় যে, মুসলমানেরা

www.pathagar.com

নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে যতই উদগ্রীব হোক না কেন, তখন পর্যন্ত তারা সর্বভারতীয় ভিত্তিতেই চিন্তা–ভাবনা করে আসছিল। পরবর্তী পর্যায়ে কায়েদে আজমের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মুসলিম লীগ যখন ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিণত হতে লাগল ঠিক সেই সময় ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ভারতের তৎকালীন সাতটি হিন্দুপ্রধান প্রদেশে কংগ্রেস প্রাদেশিক সরকার পরিচালনা করছিল। এই সকল প্রদেশে মুসলমানেরা কংগ্রেস সরকারের কাছ থেকে যে বৈষম্যমূলক ব্যবহার ও আচরণ লাভ করেছে তাতে তারা হিন্দু শাসনের ব্যাপারে অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। এই সময়ের মধ্যে মুসলমানেরা তাদের প্রতি হিন্দু নেতৃবৃন্দের যে কঠোর মনোভাব প্রত্যক্ষ করেছে তাতে মুসলমানদের পক্ষে আর সর্বভারতীয় ভিত্তিতে চিন্তা–ভাবনা বজায় রাখা সম্ভবপর ছিল না। তাই এক প্রকার অনন্যোপায় হয়েই ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে ভারতের উত্তর–পশ্চিম অংশের মুসলিমপ্রধান অঞ্চল নিয়ে একটি রাষ্ট্র এবং উত্তর-পূর্ব অংশের মুসলিমপ্রধান অঞ্চল নিয়ে আরেকটি রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। বস্তুতঃ মুসলমানদের দাবী-দাওয়া সম্পর্কে কংগ্রেসের অসহিষ্ণুতা এবং কংগ্রেসের প্রাদেশিক সরকারের কার্যাবলী মুসলমানদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করে দিয়েছিল যে, তারা হিন্দুপ্রধান ভারতে নিজস্ব জীবনপদ্ধতি নিয়ে সম্মানের সাথে বসবাস করতে সক্ষম হবে না। তাই এরপর থেকেই মুসলমানেরা স্বাধীনতার জন্য পৃথকভাবে আন্দোলন করতে শুরু করে। হিন্দুরা মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাবকে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে আখ্যায়িত করতে থাকে। পরে অবশ্য এ নামেই লাহোর প্রস্তাব ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে।

এটা সত্য যে, তখনও মুসলমানদের কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কংগ্রেসের সাথে জড়িত ছিলেন। আবার এমনও কিছু কিছু মুসলিম নেতা ছিলেন যাঁরা কংগ্রেসের সাথে জড়িত না থাকলেও মুসলমানদের জন্যে মুসলিম লীগের পৃথক রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করতেন। এসব নেতার মধ্যে ছিলেন কংগ্রেস নেতা মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, আবদুল গাফফার খান ও তাঁর ভাই ডাঃ খান, জমিয়ত নেতা মাওলানা হোসেন আহমদ মাদানী, খাকসার নেতা আল্লামা

www.pathagar.com

এনায়েতউল্লাহ্ খান মাশরেকী ও জামায়াত নেতা মাওলানা আবুল আলা মওদুদী প্রমুখ। আমার বিশ্বাস, যদি এসকল মুসলিম নেতা পাকিস্তান প্রস্তাবের প্রতি তখন সমর্থন জানাতেন তা হলে কংগ্রেস ও বৃটিশ সরকার এব্যাপারটি আরো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতেন; এমন কি উপমহাদেশের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একটি সম্মানজনক বোঝাপড়াও হয়ত সম্ভবপর হত। কংগ্রেস এই সকল মুসলিম নেতাকে ব্যবহার করে মুসলিম লীগের আন্দোলনকে দমাবার চেষ্টা করেছিল। প্রকৃতপক্ষে ভারতবিভক্তির জন্যে তৎকালে মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের বৈরী দৃষ্টিভঙ্গীই দায়ী। যেসব মুসলিম নেতা মুসলিম লীগেরর আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁরা আসলে কংগ্রেসকে পরোক্ষভাবে সহযোগিতাই করেছেন। তাই ভারতবিভক্তির জন্যে তাঁরাও কম দায়ী নন। এঁদের মধ্যে ইসলামী আদর্শের অনুসারী বড়মাপের নেতাও ছিলেন। কিন্তু তাঁদের রাজনৈতিক ভুলের কারণে তাঁরা মুসলিম জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। এর প্রমাণ ১৯৪৬ সালের নির্বাচন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকারের কাউন্সিলর পদের যে ৩০টি মুসলিম আসন ছিল তার প্রত্যেকটিতেই মুসলিম লীগের প্রার্থী জয়লাভ করেছিলেন। প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনেও সারাভারতে মুসলিম লীগের প্রার্থীই বিপুলসংখ্যক ভোটে জয়লাভ করেছেন, যার ফলে তখন থেকে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র দল হিসেবে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয়। এভাবেই মুসলমানরা মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষে রায় প্রদান করেছিল।

এই মুসলিম নেতাদের মধ্যে মাওলানা আবুল আলা মওদুদী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানে চলে আসেন এবং এই দেশে ইসলামী শাসন কায়েমের পক্ষে কাজ করতে থাকেন। যদি তিনি পূর্ব থেকেই পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থন করতেন তবে এই ভূখন্ডে ইসলামী শাসন কায়েমের ক্ষেত্রে আরো অধিক ভূমিকা রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হত। গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, ১৯৪৭ সালের প্রথম দিকে মাওলানা আবুল কালাম আজাদও কংগ্রেস নেতাদের সত্যিকার স্বরূপ বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু তখন এত দেরী হয়ে গিয়েছিল যে, তাঁর পক্ষে আর তখন বিশেষ কিছু করার ছিল না। যেমন কাশ্মীরী নেতা শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ কাশ্মীরের ভারতের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে সমর্থন দিয়ে যে

www.pathagar.com

ভুল করেছিলেন পরবর্তী পর্যায়ে তা বুঝতে পেরে সংশোধন করার আপ্রাণ চেষ্টা করেও কিছুই করতে পারেননি। আবুদল গাফফার খান ও মাওলানা হোসেন আহমদ মাদানী জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজস্ব রাজনৈতিক চিন্তাধারায় অটল ছিলেন। তাঁদের চিন্তাধারা যে ভুল ছিল ইতিহাসে তা প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৪৭ সালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অনুষ্ঠিত গণভোটে দেখা গেল যে, আবদুল গাফফার খান ও তাঁর ভ্রাতা ডাঃ খানের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও ঐ প্রদেশের জনগণ বিপুল ভোটে পাকিস্তানের পক্ষে রায় দিয়েছিল। কংগ্রেস আবদুল গাফফার খান ও তাঁর ভ্রাতা ডাঃ খানের সমর্থনের মাধ্যমে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গণভোটে জিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকে বানচাল করার এক স্বপ্ন দেখছিল। কিন্তু মুসলিম জনগণ গণভোটে সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়ে কংগ্রেসের সে আশা ধূলিসাৎ করে দেয়। কংগ্রেসের এই আশাকে নষ্ট করে দেয়ার পিছনে খান আবদুল কাইউম খানের এক বিরাট সক্রিয় ভূমিকা ছিল। আবার মাওলানা হোসেন আহমদ মাদানীর রাজনৈতিক ভূমিকাকে খর্ব করার পিছনে মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানীর নেতৃত্বে ও মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর সমর্থনে গঠিত নিখিল ভারত জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের সক্রিয় ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাওলানা হোসেন আহমদ মাদানীর কিছুসংখ্যক সমর্থক তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে মাওলানা আতাহার আলীর নেতৃত্বে নেজামে ইসলাম পার্টি গঠন করে সঠিক পথে কিছু কাজ করেছেন। মাওলানা হোসেন আহমদ মাদানীর কিছুসংখ্যক অনুসারী বর্তমান বাংলাদেশে জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম নাম নিয়ে ইসলামী আন্দোলনের কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁরা কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাঁদের কোন স্পষ্ট রাজনৈতিক চিন্তাধারা জনগণের সামনে তুলে ধরতে পারেননি। অনেকেই মনে করেন মাওলানা হোসেন আহমদ মাদানীর পুত্র মাওলানা আসাদ মাদানী, যিনি বর্তমানে ভারতীয় কংগ্রেসের একজন সক্রিয় সদস্য, তাঁরা তাঁর ভাবশিষ্য। তাই অনেকের মনে ভারতবিভক্তি সম্পর্কে তাঁদের অতীতের চিন্তাধারার কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, ভারতের যেকোন হিন্দু প্রধান রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মীদের সাথে এদেশের যেকোন রাজনৈতিক কর্মীর বা দলের সক্রিয় সম্পর্ক গড়ে উঠার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। তা না হলে এদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে ভুল

www.pathagar.com

বোঝাবুঝির সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। আমরা আশা করি জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের নেতৃবৃন্দ এই ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দেবেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর খাকসার আন্দোলন ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে যায়। এ আন্দোলনের নেতা আল্লামা এনায়েতউল্লাহ্ খান মাশরেকী হয়ত নিজের রাজনৈতিক ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। তাই খাকসার আন্দোলন একটি আদর্শবাদী সংগঠন হওয়া সত্ত্বেও ঐ ভুলের কারণে ইসলামী সমাজ গঠনের ব্যাপারে তারা সত্যিকারভাবে কোন ভূমিকাই রাখতে পারেনি।

ভারতীয় হিন্দুরা প্রথমে মুসলমানদের পৃথক অস্তিত্বই স্বীকার করেনি। পরবর্তীকালে তারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা বানচাল করার চেষ্টা চালায়। লাহোর প্রস্তাবে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে পাঞ্জাব,সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও কাশ্মীরকে নিয়ে একটি রাষ্ট্র এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে বঙ্গ (বেঙ্গল) ও আসামকে নিয়ে আরেকটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছিল। কংগ্রেস পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রথমে আসাম নিয়ে একটি গণ্ডগোল সৃষ্টির পাঁয়তারা করে। আসাম একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ নয়– এই দাবীর ধুয়া তুলে কংগ্রেস আসামকে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করার বিরোধিতা শুরু করে। এর পর তারা পাঞ্জাব ও বাংলাকে বিভক্ত করার দাবীও তোলে। তৎকালীন বৃটিশ সরকার কংগ্রেসের এ দাবীর প্রতি অহেতুক সহানুভূতি দেখাতে শুরু করেন। এ অবস্থায় উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের নতুন রাষ্ট্রটি শুধুমাত্র খণ্ডিত বাংলাকে (পূর্ববাংলা) নিয়ে টিকে থাকতে পারবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। এই প্রশ্নের মোকাবেলার জন্যে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বিজয়ী মুসলিম লীগ সদস্যদের দিল্লী কনভেনশনে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব মুসলিম প্রধান অঞ্চলের সমন্বয়ে পাকিস্তান নামে একটিমাত্র রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছিলেন তৎকালীন বাংলার নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। এই প্রস্তাবের পর তখন উপমহাদেশের বিভিন্ন মহলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। কংগ্রেস ও বৃটিশ সরকার মনে করেছিল যে, এ ব্যাপারটি নিয়ে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের মধ্যে ফাটলের সৃষ্টি হবে। কিন্তু কার্যতঃ সে ধরণের কোন কিছুই ঘটেনি।

বাংলাবিভক্তির বিরোধিতা করতে গিয়ে কয়েকজন হিন্দু ও মুসলিম নেতা বৃহত্তর

www.pathagar.com

বাংলা গঠনের আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলকে নিয়ে একটি বৃহত্তর রাষ্ট্র গঠন করা। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা শরৎচন্দ্র বসু ও মুসলিম লীগের নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তাঁদের পরিকল্পিত বৃহত্তর বাংলার মধ্যে ছিল সমগ্র বঙ্গ, আসাম এবং বিহার ও উড়িষ্যার বাংলাভাষাভাষী অঞ্চল। অবশ্য এই বৃহত্তর বাংলায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকত না। তবুও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ বঙ্গবিভাগকে ঠেকাবার জন্যই এই বৃহত্তর বাংলাকে সমর্থন দিয়েছিলেন। মুসলিম নেতৃবৃন্দ মনে করতেন যে, বৃহত্তর বাংলায় মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠতা না থাকলেও এ রাষ্ট্রে মুসলমানেরা একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী হিসেবে আপন জীবনধারা নিয়ে সহজেই চলতে পারবে, কোন অসুবিধা হবে না। কায়েদে আজমও এই বৃহত্তর বাংলাকে সমর্থন করেছিলেন। বৃহত্তর বাংলা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৭ সালে যদি পরিকল্পিত রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হত তবে তার মধ্যে ভারতের পাট ও চা উৎপাদনকারী সমস্ত অঞ্চল, সমগ্র কয়লাখনি এলাকা, আসামের তৈলক্ষেত্র, বিহারের জামশেদপুরস্থ বৃহত্তম লৌহখনি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকত। এমনকি তৎকালীন ভারতের অন্যতম বৃহৎ বন্দর কোলকাতাসহ তার শিল্পাঞ্চলও এই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হত। ঐ প্রস্তাব অনুযায়ী ভারত, পাকিস্তান ও বাংলা নামে যে তিনটি রাষ্ট্রের জন্ম হত তার মধ্যে বাংলা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হতে পারত। বাংলার এমনি একটি অত্যুজ্জ্বল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র কংগ্রেসের একগুঁয়েমি এবং বৃটিশ সরকারের হিন্দুপ্রীতি ও মুসলিমবিদ্বেষের কারণে তা বাস্তবে রূপ পেতে পারেনি। বাংলার প্রাদেশিক পরিষদে বঙ্গবিভাগের প্রস্তাব উত্থাপিত হলে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ সমর্থনকারী মুসলিম সদস্যরা এবার বঙ্গ বিভক্তির বিরুদ্ধে এবং ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতাকারী হিন্দু সদস্যরা বঙ্গ-বিভক্তির পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। এ ভাবে হিন্দু নেতৃবৃন্দের একগুঁয়েমি ও সংকীর্ণতার কারণে বৃহৎ বাংলার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

এপর্যায়ে কংগ্রেস ও বৃটিশ শ্রমিকদলের যৌথ ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে কিছু বলা প্রয়োজন। ১৯৪৬ সালের ১৬ই মে বৃটিশ ক্যাবিনেট মিশন ভারতের স্বাধীনতার জন্য যে পরিকল্পনা প্রকাশ করেছিল কংগ্রেস সেটাকে সাথে সাথেই স্বাগত

www.pathagar.com

জানিয়েছিল। এর প্রধান কারণ ছিল, ঐ পরিকল্পনায় মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরোধিতার ইঙ্গিত ছিল । মুসলিম লীগ কিন্তু সাথে সাথে ঐ পরিকল্পনার ব্যাপারে কোন মতামত প্রকাশ করেনি। কিছুদিন পর মুসলিম লীগের কাউন্সিল সভা ডাকা হয়। এ সভায় ঐ পরিকল্পনাটি বিবেচনা করে মুসলিম লীগও তাতে সমর্থন জ্ঞাপন করে। এতে অবশ্য অনেকেই অবাক হয়েছিলেন। তবে মুসলিম লীগের ঐ পরিকল্পনা গ্রহণের পেছনে দুটি প্রধান কারণ ছিল। প্রথমটি হল যে, ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক যে কোন সম্প্রদায়গত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলে প্রধান সম্প্রদায়ের উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের প্রয়োজন হবে। এর অর্থ হল–মুসলমানদের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নিতে হলে উপস্থিত মুসলিম সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন লাগবে; মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন ছাড়া কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক কোন পরিষদেই তাদের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না। দ্বিতীয় কারণটি হল–ঐ পরিকল্পনায় 'এ, বি, সি' নামে যে তিনটি পৃথক গ্রুপ করা হয়েছে, সেগ্রুপগুলো প্রতি দশ বছর অন্তর অন্তর শাসনতান্ত্রিক বিষয়াদি পুনর্বিবেচনা করতে পারবে এবং প্রয়োজন হলে এই গ্রুপগুলো সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারবে। এই গ্রুপ প্রথার মধ্যে প্রস্তাবিত পাকিস্তানের বীজ লুককায়িত ছিল বলেই মুসলিম লীগ ঐ পরিকল্পনাকে সমর্থন করেছে। অর্থাৎ হিন্দুরা যদি মুসলমানদের সাথে যুক্তিসংগত আচরণ না করে তবে ভবিষ্যতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুসলমানেরা তাদের নিজস্ব পৃথক রাষ্ট্র গঠন করতে পারবে–এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই মুসলিম লীগ ঐ পরিকল্পনা মেনে নিয়েছিল। এই বিষয়গুলো কংগ্রেস পূর্বে চিন্তাও করেনি। পরবর্তী পর্যায়ে কংগ্রেস এই দুটি বিষয়ে তাদের নিজস্ব ব্যাখ্যা হাজির করে জটিলতা সৃষ্টির প্রয়াস পায়। কংগ্রেস বলতে শুরু করে যে, এই সব বিষয়ে গণপরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে পরিবর্তন আনা যাবে। মুসলিম লীগ কংগ্রেসের এই ব্যাখ্যাতে আপত্তি উত্থাপন করে এবং ক্যাবিনেট মিশনের কাছে এই ব্যাপারে ব্যাখ্যা দাবী করে। ক্যাবিনেট মিশন মুসলিম লীগের ব্যাখ্যাকে সঠিক বলে অভিমত জ্ঞাপন করে। কংগ্রেস তবুও একগুঁয়েমী করে নিজস্ব ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে গণপরিষদের কাজে এগিয়ে যায়। মুসলিম লীগ

www.pathagar.com

গণপরিষদের অধিবেশন বর্জন করে। গণপরিষদে মুসলিম সদস্যদের অনুপস্থিতিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ মুসলমানদের উপর প্রযোজ্য হবে না বলে মুসলিম লীগ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়। ভারতের তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়াভেল মুসলিম লীগের দৃষ্টিভঙ্গীকে সমর্থন করেন। এব্যাপারটি ফায়সালার উদ্দেশ্যে ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে বৃটিশ মন্ত্রীসভার উদ্যোগে লণ্ডনে ক্যাবিনেট মিশন সদস্যবৃন্দ এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ঊর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দের মধ্যে এক পরামর্শ বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত বৈঠকে গ্রুপিংয়ের ব্যাপারে ক্যাবিনেট মিশনের সদস্যবৃন্দ ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ একই ব্যাখ্যা সমর্থন করেন। কিন্তু কংগ্রেস তার নিজস্ব ব্যাখ্যায় অটল থাকে। গণপরিষদের সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে এই গ্রুপিং ব্যবস্থা বাতিল করে দেয়া যেতে পারে–এই ধরণের দাবীতেই কংগ্রেস অবস্থান গ্রহণ করে। তখন ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়াভেলও লণ্ডনে ছিলেন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড এটলী ক্যাবিনেট মিশনের প্রদত্ত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে কাজে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে লর্ড ওয়াভেলকে নির্দেশ দেন।

এ সময়ে পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহেরুও লণ্ডনেই ছিলেন। ক্যাবিনেট মিশনের সদস্য স্যার স্ট্রাফোর্ড ক্রীপসের উদ্যোগে পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহেরুর সাথে বৃটিশ মন্ত্রীসভার কিছু সদস্যের এক গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই গোপন বৈঠকে পণ্ডিত নেহেরুর সাথে বৃটিশ শ্রমিক দলের এক বোঝাপড়া হয়। এই বোঝাপড়ায় ঠিক হয় যে, নেহেরুর এক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু লর্ড মাউন্টব্যাটেন শীঘ্রই ভারতের গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হবেন এবং মুসলমানদের জন্য এমন একটি পাকিস্তান দেয়া হবে যা অতিসত্বর বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তার বিনিময়ে ভারতীয় কংগ্রেসকে সারা ভারতে বৃটিশ স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। এই সমঝোতার ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড এটলী উপমহাদেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে বৃটিশ সরকারের এক নীতিমালা ঘোষণা করেন। এই নীতিমালায় ইংরেজদের ভারত ছেড়ে যাওয়ার সর্বশেষ সময়সীমা ১৯৪৮ সালের জুন মাস বলে ঘোষণা দেয়া হয়। এই নীতিমালার সাথে সাথেই বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড এটলী ভারতের গভর্ণর জেনারেল হিসেবে লর্ড ওয়াভেলের পরিবর্তে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের নাম ঘোষণা করেন। লর্ড

www.pathagar.com

মাউন্টব্যাটেন ভারতের গভর্ণর জেনারেল হিসেবে যোগদানের পর থেকেই পন্ডিত জওয়াহের লাল নেহেরু ও ভি. পি. মেননের সাথে মিলে একযোগে কাজ করতে শুরু করেন। তিনি ভারতে আসার পর থেকে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে বহু বৈঠক করেন এবং চিঠিপত্র আদান-প্রদান করেন। এরপর তিনি নিজেই উপমহাদেশের স্বাধীনতার জন্যে একটি খসড়া নীতিমালা তৈরী করেন। তিনি একদিন পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহেরুকে তাঁর এ খসড়া নীতিমালা দেখতে দেন। এই নীতিমালা দেখার পর নেহেরু অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। তারপর মাউন্টব্যাটেন ভি. পি. মেননকে ঐ খসড়া নীতিমালা নিয়ে পণ্ডিত নেহেরুর সাথে আলোচনা করতে বলেন এবং এই আলোচনার ভিত্তিতে সেদিন সন্ধ্যায় একটি খসড়া পরিকল্পনা তৈরী করার জন্য অনুরোধ করেন। যেহেতু পণ্ডিতজী ঐ দিন সিমলা ত্যাগ করেছিলেন সেহেতু ভি. পি. মেননকে অত্যন্ত তাড়াহুড়া করে মাত্র চার ঘন্টার মধ্যে একটি খসড়া প্ল্যান তৈরী করে পণ্ডিত নেহেরুকে দেখাতে যান। পণ্ডিতজী মেননের এই খসড়া প্ল্যান অনুমোদন করলে মেনন তা মাউন্টব্যাটেনকে প্রদান করেন। ঐ খসড়া প্ল্যানের ভিত্তিতেই ভারতের গভর্ণর জেনালের লর্ড মাউন্টব্যাটেন ১৯৪৭ সালের তেসরা জুন বেতারের মাধ্যমে উপমহাদেশের স্বাধীনতা সম্পর্কিত একটি ঘোষণা জারী করেন। এটি তেসরা জুনের ঘোষণা হিসেবে পরিচিত। এই ঘোষণায় ভারতবর্ষকে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করার প্রস্তাব ছিল। এর সাথে বাংলা এবং পাঞ্জাবকেও বিভক্ত করার প্রস্তাব উক্ত ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই ঘোষণা অনুযায়ী উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও পশ্চিম পাঞ্জাবকে এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের পূর্ব বাংলাকে নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হবে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আসামের সিলেট জেলাতে গণভোটের ব্যবস্থা করা হবে যাতে এই দুটি এলাকা ভারতে থাকবে কি পাকিস্তানে যোগ দেবে তা এলাকার জনগণই গণভোটের মাধ্যমে ঠিক করবে। যদি সিলেট পাকিস্তানে যোগ দেয়ার পক্ষে রায় দেয় তবে সিলেটসংলগ্ন আসামের মুসলিম প্রধান অংশকেও পাকিস্তানের সঙ্গে দেয়া হবে বলে ঠিক করা হয়। পাঞ্জাবের মুসলিমপ্রধান এলাকাগুলোকে নিয়ে পশ্চিম পাঞ্জাব ও অমুসলিম প্রধান এলাকাগুলিকে নিয়ে পূর্ব পাঞ্জাব গঠিত হবে। বাংলায় (বেঙ্গল) সম্পূর্ণ বর্ধমান বিভাগ, দাজিলিং, জলপাইগুড়ি, কোলকাতাসহ

www.pathagar.com

সম্পূর্ণ চব্বিশ পরগনা জেলা ও খুলনা জেলাকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ এবং বাকী সমস্ত জেলাকে নিয়ে পূর্ববঙ্গ গঠিত হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়।

পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার সীমানা, আসামের সাথে পাকিস্তানের সীমানা এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের সীমানা নির্ধারণ করার জন্যে দুটি পৃথক সীমানা কমিশন গঠন করা হয়। ঠিক করা হয় যে, প্রত্যেক সীমানা কমিশনে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস দুজন করে প্রতিনিধি মনোনয়ন দেবে এবং উভয় কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে থাকবেন বৃটিশ আইন বিশেষজ্ঞ স্যার সিরিল রেডক্লিফ। যদি মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মনোনীত ব্যক্তিরা একমত হয়ে কোন সিদ্ধান্ত দেন তবে সেসিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সীমারেখা হিসেবে গৃহীত হবে। আর তাঁরা যদি একমত হতে না পারেন তবে স্যার রেডক্লিফের সিদ্ধান্ত অনুয়ায়ী সীমানা চিহ্নিত করা হবে। বৃটিশরা জানত যে, মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মনোনীত ব্যক্তিরা কোনদিনই একমত হবেন না। তাই সীমানা নির্ধারণের মূল চাবিকাঠি বৃটিশ আইনবিশেষজ্ঞ স্যার রেডক্লিফের হাতেই রয়ে গেল। ভারতবিভাগের ব্যাপারে যে নীতির কথা বলা হয়েছিল অর্থাৎ সংলগ্ন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল ও সংলগ্ন অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে দেশবিভাগের নীতিটি কিন্তু বাংলাবিভক্তির ব্যাপারে লর্ড মাউন্টব্যাটেন মেনে চলেননি। খুলনার একটি মহকুমা অর্থাৎ সাতক্ষীরা মহকুমায় বেশ কিছু হিন্দু বসতি ছিল যার কারণে খুলনার মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ১৯৪১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ছিল ৪৯ শতাংশ এবং অমুসলিম জনসংখ্যা ছিল ৫১ শতাংশ। কিন্তু সাতক্ষীরার চতুর্দিকই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল দ্বারা ঘেরাও ছিল। সাতক্ষীরার সংলগ্ন চব্বিশ পরগনার বশিরহাট ও বারাসত মহকুমা ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা। বৃহত্তর কোলকাতাকে বাদ দিলে বস্তুতঃ সমগ্র চব্বিশ পরগনা জেলাই ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল। আর কোলকাতা অস্থানীয় লোকের উপস্থিতির কারণেই অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। শুধুমাত্র হিন্দুদের খুশী করার জন্যই খুলনা ও কোলকাতাসহ চব্বিশ পরগনা জেলাকে পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পরবর্তী পর্যায়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আসামের সিলেট জেলায় গণভোট গ্রহণ করা হয়। এই উভয় অঞ্চলই বিপুল ভোটে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করার মত যে, বৃটিশ

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী লর্ড এটলীর ২০শে ফেব্রুয়ারীর ঘোষণায় ১৯৪৮ সালের জুন মাসকে ক্ষমতা হস্তান্তরের শেষ সীমা হিসেবে বেঁধে দেয়া হলেও লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের ৩রা জুনের ঘোষণায় এই তারিখ আরো এগিয়ে দেয়ার কথা বলা হয়। শেষ পর্যন্ত বৃটিশ সরকার ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭ সালকে ক্ষমতা হস্তান্তরের তারিখ নির্ধারণ করেন। এভাবে দেড়মাসেরও কম সময়ের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের তারিখ ঠিক করা হয়। বস্তুতঃ ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়সীমা এগিয়ে দেয়ার পেছনে এক সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র কাজ করছিল। ক্ষমতা হস্তান্তরের এই ক্রান্তিকাল উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য ছিল খুবই গুরুত্ববহ। পাকিস্তান নামের যে একটা নতুন রাষ্ট্র রূপ নিতে যাচ্ছে তার প্রশাসনিক এবং আত্মরক্ষার যাবতীয় বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য এই সময়টি যে অত্যন্ত অপর্যাপ্ত, নাজুক ও গুরুত্বপূর্ণ সেব্যাপারে বৃটিশ সরকার খুবই সজাগ ছিলেন। পাকিস্তান যাত্রালগ্নে সুষ্ঠুভাবে তার শুভ সূচনা করুক বৃটিশ সরকার তা চাননি বলেই এই তারিখ এগিয়ে আনা হয়।

সিলেটের গণভোটে জেতার কারণে তার সংলগ্ন আসামের হাইলাকান্দি, নয়াপাড়া ও কাছাড় জেলা পাকিস্তানের অংশ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু রেডক্লিফ রোয়েদাদের মাধ্যমে ঐ সব অঞ্চল পাকিস্তানে আসাতো দূরের কথা, সিলেটের করিমগঞ্জকেও সিলেট থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভারতের সঙ্গে দেয়া হয়। করিমগঞ্জসহ আসামের ঐ সকল মুসলিমপ্রধান অঞ্চল যদি পাকিস্তানে দেয়া হত তবে দেশীয় রাজ্য ত্রিপুরার পক্ষে পাকিস্তানে যোগ দেয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। ত্রিপুরায় যাবার পথ দেয়ার জন্যই শুধু এই সকল মুসলিমপ্রধান অঞ্চল ভারতকে দেয়া হয়। রেডক্লিফ রোয়েদাদের মাধ্যমে খুলনা জেলাকে পাকিস্তানের সাথে দেয়া হয়। কিন্তু যশোরের একটি মুসলিমপ্রধান অঞ্চল, নদীয়ার বিরাট একটি মুসলিম প্রধানঅঞ্চল, মুসলিমপ্রধান জেলা মুর্শিদাবাদকে সম্পূর্ণভাবে, মুসলিম প্রধান জেলা মালদহের একটি ক্ষুদ্র অংশ বাদে বাকী সবটুকু এবং দিনাজপুরের পশ্চিম অংশকে পাকিস্তান থেকে কেটে নিয়ে ভারতকে দেয়া হয়। অথচ এই বিরাট মুসলিমপ্রধান এলাকা ভারতকে দেয়ার পেছনে কোন যুক্তিসংগত কারণ ছিল না। আসলে এটা ছিল বৃটিশ শ্রমিকদল এবং ভারতীয় কংগ্রেসের আঁতাতেরই ফসল। শ্রমিক দল ও কংগ্রেসের এক গোপন বোঝাপড়ার ভিত্তিতে

www.pathagar.com

মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত ছাড়া এটা আর কিছুই নয়। পশ্চিম পাঞ্জাবের বেলায়ও অনুরূপ ষড়যন্ত্র কার্যকর করা হয়। পশ্চিম পাঞ্জাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা গুরুদাসপুরকেও ঠিক তেমনিভাবে রেডক্লিফ রোয়েদাদের মাধ্যমে পূর্বপাঞ্জাবকে (ভারত) দেয়া হয়। ফলে ভারত থেকে কাশ্মীরে যাবার একমাত্র পথ পাঠানকোট সড়ক সম্পূর্ণভাবে ভারতের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এই পাঠানকোট সড়কটি যদি ভারত ব্যবহার করতে না পারত তবে ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারতের পক্ষে কাশ্মীরে সেনাবাহিনী ও যুদ্ধ সরঞ্জাম পাঠানো কোনক্রমেই সম্ভবপর হত না। ভারতের কাশ্মীর দখলের পশ্চাতে পাঠানকোট রাস্তার এক বড় ভূমিকা ছিল। গুরুদাসপুর জেলাকে ভারতে দেয়ার পেছনে রেডক্লিফের যে কী অসৎ উদ্দেশ্য ছিল তা এখন স্পষ্ট বোঝা যায়।

আমাদের দেশে প্রায়শঃ 'কাশ্মীর ভারতে গেলে আমাদের কি' বলে কেউ কেউ দায়িত্বহীন উক্তি করে থাকেন। কিন্তু এতে উপমহাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে তাঁদের অজ্ঞতাই প্রকাশিত হয়ে পড়ে। যাঁরা এসব কথাবার্তা বলেন তাঁরা কিন্তু জানেন না যে,যদি কাশ্মীর পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হত তবে ভারত উজানে নদীর পানি বন্ধ করে বাংলাদেশকে শুকিয়ে মারার কথা চিন্তাও করতে পারত না। কারণ ভারতের পাঞ্জাব ও হরিয়ানা যাকে ভারতের শস্যভান্ডার বলা হয় সেঅঞ্চলে প্রবাহিত নদীর উৎস হল কাশ্মীর। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের পানি উজানে আটকানোর ব্যবস্থা নেয়া হলে কাশ্মীরের নদীর পানিও ভিন্নপথে প্রবাহিত করার ব্যবস্থা গৃহীত হতে পারত। আজ ভারত অন্যায়ভাবে ফারাক্কা ব্যারেজ তৈরী করে গঙ্গার পানি নিয়ন্ত্রণ করছে। এই ফারাক্কা ব্যারেজের একপ্রান্তে মুর্শিদাবাদ, অন্যপ্রান্তে মালদহ। এই উভয় জেলাই মুসলিম প্রধান এলাকা হিসেবে রেডক্লিফ রোয়েদাদের আগে পূর্ব পাকিস্তানের এলাকারূপে চিহ্নিত ছিল। এমনকি এই উভয় জেলায় ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট পাকিস্তানের পতাকা উড়েছিল। কিন্তু এই রোয়েদাদ বাস্তবায়নের সময় এই মুসলিম প্রধান এলাকা দুটি ভারতকেই দেয়া হয়। রেডক্লিফ রোয়েদাদ বাস্তবায়নের মাধ্যমে এভাবে পাকিস্তানকে ঘায়েল করারই চক্রান্ত চলেছিল।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন তাঁর ৩রা জুনের ঘোষণায় মুসলিম ও অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল সংলগ্ন এলাকার ভিত্তিতে সীমানা নির্ধারণ করার কথা বলেছিলেন। সাথে

www.pathagar.com

সাথে 'অন্যান্য বিষয় বিচেনা করার অধিকারও' সীমানা কমিশনকে দেয়া হয়েছিল। এই অন্যান্য বিষয় বিবেচনার ছদ্মাবরণে স্যার সিরিল রেডক্লিফ পূর্ব বাংলাকে এমনিভাবে সংকুচিত করে দিয়েছিলেন যে, একটি পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে নিরাপদ সীমানা ও প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক শক্তি নিয়ে টিকে থাকা যেন তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। এভাবে পূর্বাঞ্চলের দেশীয় রাজ্য ত্রিপুরাকে এবং পশ্চিমাঞ্চলের দেশীয় রাজ্য কাশ্মীরকে রেডক্লিফ রোয়েদাদের মাধ্যমে গোপনে ভারতের কাছে দেয়ারই ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

এরকমই ছিল রেডক্লিফ রোয়েদাদের চক্রান্ত। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, রেডক্লিফের এই অন্যায় রোয়েদাদ মুসলিম লীগ কেন মেনে নিয়েছিল? এক্ষেত্রে আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, মাউন্টব্যাটেন তাঁর ৩রা জুনের ঘোষণায় বলেছিলেন–যদি এই ঘোষণার ভিত্তিতে মুসলিম লীগ ক্ষমতা নিতে রাজী না হয়, তবে কেন্দ্রীয় গণপরিষদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে বৃটিশ সরকার ভারত ছেড়ে চলে যাবেন। মুসলিম লীগ এভাবে ক্ষমতা নিতে রাজী না হলে বৃটিশরা ভারতীয় কংগ্রেসের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে চলে গেলে উপমহাদেশের মুসলমানদের অবস্থা প্যালেস্টাইনী মুসলমানদের চেয়েও করুণ হত। বস্তুতঃ বৃটিশরা প্যালেস্টাইনী আরবদেরকে যে ফাঁদে ফেলেছিল ভারতীয় মুসলিম লীগকেও সেই ফাঁদে ফেলার ব্যবস্থা করেছিল। বৃটিশদের সেই ফাঁদে ধরা না দিয়ে ভারতীয় মুসলিম লীগ পাকিস্তান হাসিল করে অত্যন্ত সঠিক কাজই করেছে, এতে উপমহাদেশীয় মুসলমানেরা এক ভয়াবহ করুণ অবস্থা থেকে রক্ষা পেয়েছে। বৃটিশ সরকার ও ভারতীয় কংগ্রেসের ষড়যন্ত্রের ফলে মুসলিম লীগের উপর যে চাপের সৃষ্টি হয়েছিল তার কারণেই মুসলিম লীগ 'Truncated Pakistan' (খণ্ডিত পাকিস্তান) গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। ফলতঃ পরবর্তীপর্যায়ে ১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে পৃথক হয়ে যখন স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটল তখন দেখা গেল রেডক্লিফ রোয়েদাদ প্রকৃতপক্ষে Truncated East Pakistan অর্থাৎ Truncated Bangladesh–ই সৃষ্টি করে গিয়েছিল। তখন অবস্থা এমন ছিল যে, ঐ Truncated Pakistan গ্রহণ করা ছাড়া মুসলিম লীগের আর কোন উপায় ছিল না। মুসলিম লীগ এভাবে ভারতীয় মুসলমানদের এক বিরাট অংশকে হিন্দুদের শোষণ থেকে রক্ষা করে

www.pathagar.com

তাদের নিজস্ব একটি আবাসভূমি দিয়ে গেছে। কংগ্রেসের সাথে যোগসাজস করে বৃটিশ সরকার পাকিস্তানের জন্য বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা সমস্যা সৃষ্টি করে গেছেন। তারা মনে করেছিল এত সমস্যা নিয়ে স্বাধীন পাকিস্তান টিকে থাকতে পারবে না। কিন্তু আল্লাহ্‌র রহমতে কায়েদে আজম মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বে পাকিস্তানীদের দৃঢ় মনোবল ও প্রগাঢ় দেশপ্রেমের কারণে পাকিস্তান টিকে গেল। এমনকি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে পূর্ব পাকিস্তান পৃথক হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ হওয়ার পরও পাকিস্তান টিকে রইল, শুধু যে টিকে রইল তা নয়, বরং পূর্বের চেয়ে আরও অধিক শক্তিশালী অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে রইল।

এখানে আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যে পূর্ব পাকিস্তানকে বৃটিশরা খুব বেশী দুর্বল করার ব্যবস্থা করেছিল সেই পূর্ব পাকিস্তানই পাকিস্তান থেকে পৃথক হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে আজ প্রায় ২৫ বৎসর বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান যদি স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে যাত্রা শুরু করত তবে তা টিকে থাকত কিনা সন্দেহ। কারণ তখন পূর্ব পাকিস্তান যেমন ছিল অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল, তেমনি প্রতিরক্ষার দিক দিয়েও ছিল অতিদুর্বল; এমনকি প্রশাসনিক দিক দিয়েও ছিল হতাশাব্যঞ্জক। বস্তুতঃ সুদীর্ঘ ২৪ বৎসর পাকিস্তানের সাথে একত্রে থাকার ফলে পূর্বপাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশ ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক, প্রতিরক্ষাগত ও প্রশাসনিক দিক দিয়ে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে যায়। বৃটিশ ও কংগ্রেসের চক্রান্ত মোকাবেলা করার লক্ষ্যে ১৯৪৬ সালের দিল্লী কনভেনশনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে নিয়ে একটি মাত্র রাষ্ট্র গঠনের যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন তা যে সঠিক ছিল এখন তা অনেকেই উপলব্ধি করতে পারছেন। প্রসঙ্গতঃ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দাক্ষিণাত্যের দেশীয় রাজ্য হায়দরাবাদ তখন অর্থনীতি, দেশরক্ষা ও প্রশাসনের দিক দিয়ে তৎকালীন পূর্ব বাংলার তুলনায় অনেক শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও সেখানে কি ঘটেছিল নিশ্চয় তা অনেকেই জানেন। হায়দরাবাদ নিজস্ব স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে চাইলেও ভারতের আগ্রাসনের কারণে তা সম্ভব হয়নি। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের দুটি পৃথক অঞ্চলকে নিয়ে দুটি পৃথক রাষ্ট্র গঠন না করে একটি মাত্র রাষ্ট্র কায়েম করায়

www.pathagar.com

মুসলিম লীগ ভুল করেছিল বলে যাঁরা মনে করেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এখন তাঁরা এই ইতিহাসের নিরিখে বিষয়টির সঠিক মূল্যায়ন করতে পারছেন।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন পাকিস্তানকে ঘায়েল করার জন্য আরো একটি চক্রান্ত করেছিলেন। তিনি নিজেই ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের প্রথম গভর্ণর জেনারেল হওয়ার প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র নিকট। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন বৃটিশ-ভারতের গভর্ণর জেনারেল হওয়ার পর থেকে হিন্দুপ্রীতি ও মুসলিমবিদ্বেষের যে নমুনা একের পর এক দেখিয়ে গেছেন তাতে তাঁকে নবগঠিত পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল হিসেবে মেনে নিতে কায়েদে আজম মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। এজন্য তিনি মাউন্টব্যাটেনের প্রস্তাব নাকচ করে দেন। কায়েদে আজম জানতেন যে, লর্ড মাউন্টব্যাটেন ইতিমধ্যেই স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল হওয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা ঠিক করে রেখেছেন। তাই কায়েদে আজম লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে বলেছিলেন যে, মাউন্ট ব্যাটেন চাইলে তাঁকে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনালের হিসেবে তিনি মেনে নিতে রাজী আছেন, কিন্তু ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের গভর্ণর জেনারেল হিসেবে তাঁকে মেনে নিতে পারেন না। কারণ ভারত যখন বিভক্ত হয়ে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে তখন এই দুটি পৃথক রাষ্ট্রের দু'জন পৃথক গভর্ণর জেনারেল হওয়াই উচিত। কায়েদে আজমের এই কথা শুনে লর্ড মাউন্টব্যাটেন অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। তারপর থেকে তিনি কায়েদে আজমকে মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। যদি মাউন্ট ব্যাটেনকে উভয় রাষ্ট্রের গভর্ণর জেনারেল হিসেবে মেনে নেয়া হত তবে তিনি যে তাঁর পদের সুযোগ গ্রহণ করে পাকিস্তানের জন্যে নতুন নতুন প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টির চেষ্টা করতেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের জানা আছে প্রথম দিকে ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের প্রধান সেনাপতি হিসেবে জেনারেল অচিনলেক কিছুদিন কাজ করেছিলেন। উভয় রাষ্ট্রের প্রধান সেনাপতি হওয়ায় সেই সময়ে তাঁর পক্ষে প্রতিরক্ষাগত ন্যায্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশীয় রাজ্য কাশ্মীরে প্রথম যখন হিন্দু মহারাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল তখন পাকিস্তানী আধা-সামরিক বাহিনীর কিছু কিছু লোক ঐ বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেছিল। এক পর্যায়ে বিদ্রোহীরা যখন শ্রীনগরের উপকণ্ঠে উপস্থিত হয় তখনই কাশ্মীরের

www.pathagar.com

মহারাজা ভারতের সাথে যোগদানের ব্যবস্থা নেন। এমনি এক পরিস্থিতিতে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলী খানকে, যিনি তখন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীও ছিলেন, কাশ্মীরে এক প্লাটুন সৈন্য পাঠিয়ে শ্রীনগর বিমানবন্দর দখল করে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কায়েদে আজমের নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে লিয়াকত আলী খান তখন দিল্লীতে অবস্থানরত জেনারেল অচিনলেককে করাচীতে ডেকে পাঠান। জেনারেল অচিনলেক একদিন পর করাচীতে আসেন। তাঁকে লিয়াকত আলী খান যখন কাশ্মীরে সৈন্য পাঠাবার কথা বললেন, তখন অচিনলেক বলেন, "আমি গতকালই ভারতীয় সৈন্যদেরকে কাশ্মীর যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছি। এখন পাকিস্তানী সৈন্যদেরকেও কাশ্মীরে যাওয়ার আদেশ দিয়ে আমার দুই সৈন্যবাহিনীকে পরস্পরের মোকাবেলা করার অবস্থা আমি সৃষ্টি করতে পারি না।"

যদি একদিন আগেও পাকিস্তানী সৈন্যরা শ্রীনগর বিমানবন্দর দখল করে নিতে পারত তবে ভারতীয় সৈন্যদের পক্ষে বিমানযোগে শ্রীনগরে গিয়ে বিদ্রোহীদের হাত থেকে এই শহরকে রক্ষা করা সম্ভব হত না, যার ফলে কাশ্মীরের এই জনবিদ্রোহ সফল হতে পারত। বিদ্রোহীরা যদি একবার শ্রীনগর দখল করে নিতে পারত তাহলে কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ তখন ভারতীয়দের হাতে যেতে পারত না। শুধুমাত্র উভয় রাষ্ট্রের সেনাপ্রধান একই ব্যক্তি হওয়ার কারণেই এই প্রতিরক্ষাগত অসুবিধা দেখা দিয়েছিল এবং শ্রীনগর দখল করা পাকিস্তানের পক্ষে সম্ভব হল না। এভাবেই কাশ্মীরীদের আত্মনিয়ন্ত্রণমুখী জনবিদ্রোহ ব্যর্থ হল। এতে এটা স্পষ্ট যে, উভয় রাষ্ট্রের গভর্ণর জেনারেল যদি একই ব্যক্তি হতেন, তবে কত নতুন নতুন সমস্যার যে সৃষ্টি হত তা কল্পনা করাও যায় না। কায়েদে আজমের তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কারণেই নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান এমনি ধরণের কত সমস্যা থেকে যে রক্ষা পেয়েছে তা আল্লাহ্ পাকই জানেন।

প্রসংগতঃ এখানে আরো একটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। আমাদের দেশে একশ্রেণীর লোক আছেন যাঁরা বলতে চান কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ যে দ্বিজাতিতত্ত্ব দিয়েছিলেন তা সম্পূর্ণ ভুল ছিল। এই দ্বিজাতিতত্ত্বর উপর ভিত্তি করে ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল। তাই তাঁরা পাকিস্তান

www.pathagar.com

সৃষ্টিকে ভুল বলতে চান। তাঁরা এ ধরণের ব্যাখ্যাও হাজির করতে চান যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তান পৃথক হয়ে বাংলাদেশ হওয়ার কারণে দ্বিজাতিতত্ত্ব ভুল বলে প্রমাণিত হয়ে গেছে। কিন্তু ইতিহাসের প্রেক্ষিত বিবেচনা করলে তাঁদের এ ধরণের দাবীর পেছনে কোন যুক্তিই খুঁজে পাওয়া যায় না। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ পাকিস্তান থেকে পৃথক হয়ে নিজেদের জন্য বাংলাদেশ নামক একটি নতুন রাষ্ট্র গঠন করেছে। তারা পৃথক হয়ে নতুন রাষ্ট্র গঠন না করে ভারতের সাথে তো এক হয়ে যেতে চায়নি। এতে পূর্ব বাংলার মানুষের পৃথক জাতিসত্তাই প্রমাণিত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে তারা যদি তখন ভারতের সাথে যুক্ত হতে চাইত তবে তাদের অভিন্ন ভারতীয় জাতি সত্তার পরিচয় পাওয়া যেত, কিন্তু ইতিহাসে তা ঘটেনি। বাংলাদেশের মানুষ পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করে প্রমাণ করল যে, ভারত থেকে তাদের আলাদা জাতিসত্তার অস্তিত্ব রয়েছে। এখানে ভুলে গেলে চলবে না যে, কায়েদে আজম দ্বিজাতিতত্ত্ব দেয়ার পরেই ভারতীয় মুসলমানদের জন্য দুটি পৃথক রাষ্ট্রের দাবী উত্থাপন করেছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে ভারতীয় কংগ্রেস ও বৃটিশ শ্রমিকদলের চক্রান্তের কারণেই নিজেদেরকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ঐ দুই রাষ্ট্রের সমন্বয়ে একটি মাত্র ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে। আল্লাহ্ পাকের অশেষ রহমতে পাকিস্তান ভারতীয় কংগ্রেস ও বৃটিশ শ্রমিক দলের ঐ ষড়যন্ত্র কাটিয়ে সুদীর্ঘ ২৪ বৎসরের মধ্যে নিজের দৃঢ় অস্তিত্ব কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিল। এর ফলশ্রুতিতে পরে পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে দুটি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং এই দুটি রাষ্ট্র আজ প্রায় ২৫ বৎসর ধরে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে দ্বিজাতিতত্ত্ব ভুল বলে ত প্রমাণিত হলই না, বরং উপমহাদেশের মুসলমানেরা যে হিন্দুদের থেকে একটি আলাদা জাতি তা আরো দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল। আমাদের এটা নিশ্চয় স্মরণ থাকার কথা যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান থেকে মুক্ত হয়ে দেশে পদার্পণ করার সাথে সাথে বাংলাদেশকে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ ও.আই.সি'র সদস্যভুক্ত হয়ে এই দ্বিজাতিতত্ত্বের সত্যকে যেন আরো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে।

www.pathagar.com

ইতিহাস এ সত্য স্বীকার করতে বাধ্য যে, কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র ন্যায় তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তির নেতৃত্বের ফলে মুসলিম লীগের পক্ষে ভারতীয় কংগ্রেস ও বৃটিশ সরকারের চক্রান্ত নস্যাৎ করে পাকিস্তান অর্জন সম্ভব হয়েছিল। আমাদের আরো সৌভাগ্য যে, ভারতীয় মুসলমানেরা তখন আলাদা আবাসভূমির জন্য কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র পিছনে দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তৎকালীন কংগ্রেস ও বৃটিশ নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে কায়েদে আজমের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছিলেন।

শেষ জীবনে কায়েদে আজম এক কঠিন দুরারোগ্য রোগে ভুগছিলেন। তিনি কোনদিন তাঁর এই রোগ সম্বন্ধে কাউকে জানতে দেননি। যদি তাঁর এই রোগ সম্পর্কে বৃটিশরা জানত তবে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারটি আরো পিছিয়ে যেত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বৎসরখানেক পরেই কায়েদে আজম ইন্‌তেকাল করেন। তিনি যদি আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতেন তবে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ভিত্তি দৃঢ়করণে ও শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে আরো বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেয়া হত বলে আমাদের বিশ্বাস। জাতির আরো দুর্ভাগ্য এই যে, কায়েদে আজমের পর তাঁরই হাতে গড়া যে ব্যক্তিটি পাকিস্তানের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন সেই কায়েদে মিল্লাত লিয়াকত আলী খানও বেশী দিন বেঁচে ছিলেন না। তিনি কায়েদে আজমের ইন্‌তেকালের পর তিন বৎসরের মধ্যেই পাঞ্জাবীদের এক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে এক জনসভায় ভাষণদানকালে আততায়ীর গুলীতে নিহত হন। লিয়াকত আলী খান তৎকালীন ভারতের যুক্তপ্রদেশের এক নওয়াব পরিবারের লোক ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল ধরে ভারতীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে কায়েদে আজমের সাথে কাজ করেছিলেন। কায়েদে আজমের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও তাঁরই হাতে গড়া এই নেতার অবর্তমানে তখন পাকিস্তানের নেতৃত্বে এক বিরাট সংকট দেখা দেয়। তাঁর ইন্‌তেকালের পর পাঞ্জাবের কতিপয় নেতা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে এগিয়ে আসেন। তাঁরা কিন্তু পাকিস্তানের অগ্রগতিতে সহায়তা করার পরিবর্তে মাঝে মাঝে বাধারই সৃষ্টি করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

এখানে ইতিহাসের আরো একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে আমি মনে

www.pathagar.com

করি। কায়েদে আজমের রাজনীতি ছিল অনেক উঁচুমানের। তিনি ভারতীয় মুসলমানদের ন্যায্য স্বার্থ রক্ষার জন্য অনেক কিছুই করেছেন। তাঁর কাছে এদেশের মানুষ বহুভাবে ঋণী। তবে মহান ব্যক্তিদের জীবনেও মাঝেমধ্যে ভুল পরিলক্ষিত হয়। কায়েদে আজমের জীবনেও এমনি একটি ভুল ছিল। বিশেষ এক ব্যক্তির প্রতি তাঁর দুর্বলতার কারণে তিনি একটি রাজনৈতিক ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন যার জন্য তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তখন বাংলার (বেঙ্গল) মুসলমানদের বিশিষ্ট নেতা হিসাবে খাজা নাজিমউদ্দিন এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তৎকালীন রাজনৈতিক মহলে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা উভয়ে ছিলেন বিদ্বান লোক এবং তাঁদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাও ছিল যথেষ্ট। তবে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও ব্যক্তিত্বের দিক দিয়ে খাজা নাজিমউদ্দিনের চেয়ে অনেক উঁচু মাপের। পক্ষান্তরে খাজা নাজিমউদ্দিন ছিলেন একটু নম্র স্বভাব ও দুর্বল ব্যক্তিত্বের লোক। তিনি অন্যের দ্বারা বেশী প্রভাবিত হতেন। শোনা যায়, তিনি তাঁর ভাই খাজা শাহাবউদ্দিনের দ্বারা পরিচালিত হতেন। এই দুই নেতাই কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। কেন জানি না কায়েদে আজম খাজা নাজিমউদ্দিনকেই অধিক পছন্দ করতেন। বাংলাবিভক্তির সময় পূর্ব বাংলা সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচনের ব্যাপারে সকলের ধারণা ছিল যে, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পূর্ব বাংলা সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হয়ে পূর্ব বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী হবেন। সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচনের সময় হঠাৎ কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ খাজা নাজিমউদ্দিনকেই নেতা নির্বাচিত করার জন্য সংসদ সদস্যদের নিকট আবেদন জানান। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বিপুল সমর্থন থাকা সত্ত্বেও কায়েদে আজমের আবেদনের প্রেক্ষিতে খাজা নাজিমউদ্দিনই পূর্ব বাংলার সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হন। নেতা নির্বাচিত হতে না পেরে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ক্ষুব্ধ হয়ে পূর্ব বাংলায় না এসে পশ্চিম বাংলাতেই রয়ে যান। এতে পূর্ব বাংলা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ন্যায় একজন প্রজ্ঞাবান ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতার সেবা থেকে বঞ্চিত হল। দেশ বিভাগের পরে পূর্ব পাকিস্তানে যে সকল নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল খাজা নাজিমউদ্দিন

www.pathagar.com

সেসব সমস্যার মোকাবেলা তেমন সফলভাবে করতে পারেননি। যদি তখন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পূর্ব বাংলা পেত তবে ঐ সকল সমস্যার সমাধান আরো অধিক সফলতার সাথে নিষ্পন্ন করা যেত। এখানে দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, দেশ বিভাগের পর ভারত থেকে আগত বেশ কিছু উর্দুভাষী আই. সি. এস. সরকারী কর্মকর্তাকে নিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল সবচেয়ে বড় সমস্যার। তাঁরা এক ধরণের অহমিকায় ভুগতেন এবং এদেশের জনগণের চিন্তাধারার সাথেও তাঁরা সম্যকভাবে পরিচিত ছিলেন না। খাজা নাজিমউদ্দিন এ সকল কর্মচারীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন নি। কিন্তু অধিকতর ব্যক্তিত্ববান নেতা হিসেবে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পক্ষে তাঁদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ ছিল। তাঁর প্রজ্ঞার কাছে এই সকল সরকারী কর্মচারী মাথা নত করতে বাধ্য হতেন।

কায়েদে আজমের মত একজন মহান নেতার ভুল ছিল এখানেই। তিনি অধিকতর যোগ্য ব্যক্তি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর চেয়ে কম ব্যক্তিত্ববান নেতা খাজা নাজিম উদ্দিনকে সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচনে সহায়তা করেছিলেন। তখন সরকারের দুর্বলতার কারণে এখানে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকারী কর্মচারীরাই প্রাধান্য বজায় রেখেছিলেন; রাজনৈতিক নেতাদের ভূমিকা ক্রমেই গৌণ হতে শুরু করল যার ফলে জনগণের উপর সরকারের প্রভাব দিনের পর দিন কমতে থাকল। এদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তখন দলীয় গ্রুপিংয়ের কারণে সরকারের কাছ থেকে যথাযথ গুরুত্ব পাচ্ছিলেন না। বগুড়ার মোহাম্মদ আলী ও কুষ্টিয়ার ডাঃ আবদুল মালেক প্রমুখ রাজনৈতিক ব্যক্তিকে তৎকালীন প্রাদেশিক সরকার কোন রকম গুরুত্বই দেননি। কারণ তাঁরা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ লোক ছিলেন। বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে রেঙ্গুনে রাষ্টদূত করে পাঠানো হল এবং ডাঃ আবদুল মালেককে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার অন্তর্ভুক্ত করা হল। যদি খাজা নাজিমউদ্দিনের পরিবর্তে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হতেন তবে এ ধরণের ব্যাপার হত না এবং পূর্ব বাংলায় আমলাতন্ত্রও এমনিভাবে গেড়ে বসতে পারত না।

খাজা নাজিমউদ্দিন ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী দুজনই ছিলেন বাংলার বিশিষ্ট মুসলিম নেতা। ১৯৪৬ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কোলকাতার

www.pathagar.com

ডায়মণ্ড হারবারের মুসলিম নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি বাংলার (বেঙ্গল) সর্বশেষ প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি ছিলেন কোলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পূর্বে খাজা নাজিমউদ্দিন বাংলার প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হওয়ার পর খাজা নাজিমউদ্দিন বাংলার রাজনীতি ছেড়ে মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় রাজনীতির সাথে নিজেকে জড়িত রাখেন। খাজা নাজিমউদ্দিন ঢাকার নওয়াব পরিবারের লোক ছিলেন। এই নওয়াব পরিবার থেকেই মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা নওয়াব সলিমউল্লাহ এসেছিলেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী জন্ম গ্রহণ করেন পশ্চিম বাংলার মেদিনীপুর জেলার সম্ভ্রান্ত সোহরাওয়ার্দী পরিবারে। ভারতীয় মুসলমানদের ইতিহাসে স্মরণীয় বেশ কয়েকজন ব্যক্তি এই সোহরাওয়ার্দী পরিবার থেকেই এসেছিলেন। খাজা নাজিমউদ্দিন বয়সের দিক দিয়ে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কিছু বড় ছিলেন। সে কারণে শহীদ সোহরাওয়ার্দী খাজা নাজিমউদ্দিনকে ইতিপূর্বে নেতা হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন। তবে ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রারম্ভে এই দুই নেতার মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। এর ফলে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সংসদীয় বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী খাজা নাজিমউদ্দিনের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন। খাজা নাজিমউদ্দিন তাঁর এই পরাজয় স্বীকার করে নেন। তার পরই তিনি বাংলার রাজনীতি ছেড়ে দিল্লীতে মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় রাজনীতির সাথে জড়িত হয়ে পড়েন। অবশ্য উভয় নেতারই অনেক গুণ ছিল। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন প্রবল ব্যক্তিত্বের লোক আর খাজা নাজিমউদ্দিন ছিলেন সৎ ও নম্র স্বভাবের।

এখানে আরেকটি ব্যাপারের উল্লেখ করতে চাই। নেতৃত্বের গুণের উপর গুরুত্ব দিলে দেশের অনেক উপকার হয়। পশ্চিম পাঞ্জাবে ফিরোজ খান নুনের সমর্থন ছিল বেশী। কিন্তু মামদুতের খান মোহাম্মদ ইফতিখার হোসেন খান ছিলেন পূর্ব পাঞ্জাবের। তাঁর সমস্ত জমিদারিই ছিল পূর্ব পাঞ্জাবে। তাঁকে পশ্চিম পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী করে আনার জন্য সংসদ সদস্যদের কাছে কায়েদে আজম আবেদন জানান। তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মামদুতের খান পশ্চিম পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। এটা দুঃখের বিষয় যে, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

www.pathagar.com

পশ্চিম বাংলার হওয়া সত্ত্বেও কায়েদে আজম তাঁর বিপক্ষে মতামত দিয়ে ছিলেন। একথা বলতে আমার দ্বিধা নেই যে, নেতৃত্বের গুণগত মানের দিক দিয়ে পাঞ্জাবের ফিরোজ খান নুন ও বাংলার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী উভয়ই তাঁদের প্রতিপক্ষের চেয়ে অনেক বড় মাপের নেতা ছিলেন। বিশেষ ব্যক্তির প্রতি কায়েদে আজমের দুর্বলতার কারণে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রতি বিরাট অবিচার করা হয়েছে, যার ফলে পূর্ব বাংলা হয়েছে অপূরণীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

এখানে বগুড়ার মোহাম্মদ আলী সম্বন্ধেও কিছু বলা প্রয়োজন। তিনি এক পর্যায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হয়েছিলেন। জাতিসংঘেও তিনি পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন। ১৯৫২ সালে পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ খাজা নাজিমউদ্দিনকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেন। তখন ওয়াশিংটন থেকে বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে ডেকে এনে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করা হয়। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি কলম্বো ও বান্দুংয়ের দুটি ঐতিহাসিক সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। তিনি সেখানে তাঁর কূটনৈতিক প্রতিভার যে পরিচয় দিয়েছিলেন তা বিশ্বের কূটনীতির ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই দুই সম্মেলনের মাধ্যমে তিনি কমিউনিষ্ট চীনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইয়ের সাথে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন যার ফলে ধীরে ধীরে কমিউনিষ্ট চীন ও পাকিস্তান পরস্পরের বন্ধু রাষ্ট্র হয়ে উঠে। তিনিই পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতির মূল কাঠামো তৈরী করে যান। এই কাঠামোর উপর ভিত্তি করে এখনও পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হচ্ছে। পাকিস্তানের নিজস্ব নিরাপত্তার খাতিরে ঐ কাঠামোর ভিত্তিতেই ভবিষ্যতেও তার পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হতে হবে। আমাদের বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিও ঐ কাঠামোকে অনুসরণ করে চলছে। আমাদের দুঃখ এই যে, এই ধরণের একজন উঁচু মাপের রাজনীতিক ও কূটনীতিবিদের সেবা থেকে বাংলার বিভক্তির সময় আমরা বঞ্চিত হয়েছিলাম। খাজা নাজিমউদ্দিনের দলীয় গ্রুপিংয়ের কারণে তখন এ রকম উপযুক্ত ব্যক্তিদের সেবা থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত হতে হয়েছে। যদি আমরা খাজা নাজিমউদ্দিনের পরিবর্তে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মত নেতাকে প্রথম থেকে পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পেতাম তবে বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর মত উঁচু স্তরের

www.pathagar.com

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সেবা থেকে এদেশ বঞ্চিত হত না। বিশেষ ব্যক্তির প্রতি কায়েদে আজমের যে দুর্বলতার কারণে দেশের এক্ষতি হলো, সে ধরণের দুর্বলতা কায়েদে আজমের মত অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ও প্রজ্ঞাবান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে আমরা আশা করিনি।

এদেশের বিরুদ্ধে ভারতের ষড়যন্ত্রের ইতিহাসও আলোচনা করা প্রয়োজন। ভারত সরকার পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে এদেশকে তাদের নিয়ন্ত্রণে নেয়া যায় কিনা তার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে যখন শেখ মুজিব এদেশের নেতৃত্ব পুনরায় গ্রহণ করেন তখন ভারতের ঐ চেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হয়। এখানে এ প্রসঙ্গে ইতিহাসের আরো কিছু কথা বলা নিতান্ত প্রয়োজন। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ তাঁদের প্রয়োজনে আওয়ামী লীগকে সমর্থন দিলেও এদলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের উপর তাঁরা কিন্তু পুরো আস্থা রাখতে পারেন নি। এর প্রধান কারণ হল যে, শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন তাঁর রাজনৈতিক গুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর একনিষ্ঠ ভক্ত। আর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রতি ভারতীয় নেতারা ছিলেন নানা কারণে নাখোশ। শেখ মুজিবের উপর আস্থা রাখতে না পারায় ভারতীয় নেতারা আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবের বিভিন্ন কাজে নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য আওয়ামী লীগের মধ্যে তাঁদের সৃষ্ট কিছু কিছু এজেন্ট এবং বিশেষতঃ ছাত্রলীগের উপরই নির্ভর করতেন। শেখ মুজিব তাঁর নিজের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য হিন্দুদের সমর্থন চাইলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি তাঁর নিজস্ব মূর্তিতে দেখা দিতেন। তবে শেখ মুজিবের ব্যক্তিত্বের কারণে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পূর্বে তাঁর মতের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস তাঁর দলের কারো ছিল না। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ছাত্রলীগের নেতৃত্বের মধ্যে শেখ মুজিবের বলয়ের বাইরে থেকে ছাত্র আনার চেষ্টা সবসময় করতেন। এই ব্যাপারটি বুঝতে পেরে শেখ সাহেব ছাত্রলীগের সভাপতি ও সম্পাদকের পদে নিজস্ব লোককে মনোনয়ন দিতে শুরু করলেন। ১৯৬৯ সালে সিরাজুল আলম খানের মাধ্যমে ভারতীয় নেতারা আ. স. ম. আবদুর রবকে ছাত্রলীগের সভাপতি ও শাহজাহান সিরাজকে সাধারণ সম্পাদক করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন বলে জানা যায়। শেখ মুজিবুর রহমান তখন মনোনয়নের মাধ্যমে নূরে আলম সিদ্দিকীকে ছাত্রলীগের

www.pathagar.com

সভাপতি ও আবদুল কুদ্দুস মাখনকে সাধারণ সম্পাদক করলেন। পরবর্তী পর্যায়ে সিরাজুল আলম খানের চেষ্টায় আ. স. ম. আবদুর রবকে ডাকসুর সহ-সভাপতি ও শাহজাহান সিরাজকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়। তখন থেকে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ডাকসুকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে শুরু করেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পরে নির্বাচিত প্রতিনিধির অহংবোধ নিয়ে আওয়ামী লীগের কিছু কিছু নেতা ও ডাকসু নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিবের বিভিন্ন কাজে বাধার সৃষ্টি করতে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পরে শেখ মুজিব তাঁর নিজস্ব চিন্তায় আর কাজ করতে পারেন নি। ভারতীয় কিছু এজেন্টের প্রভাবে তাঁকে কাজ করতে হয়েছে। আন্দোলনের প্রকৃত নেতৃত্বও তাঁর হাতে আর তখন ছিলনা, যদিও জনসাধারণের কাছে একমাত্র শেখ মুজিবই তখন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। অথচ নেতৃত্বের মোহ শেখ মুজিবকে এত বেশী অন্ধ করে ফেলেছিল যে,তখন তিনি ভারতীয় এজেন্টদের মতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করার সাহসও পেতেন না। তাঁদের দেয়া ছকেই তখন তাঁকে চলতে হত। শেখ মুজিবের উপর ভারতীয় নেতৃবৃন্দের তেমন আস্থা ছিল না। তাই ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ তিনি ভারতে না গিয়ে পাকিস্তানী সেনাদের হাতে আত্মসমর্পণ করেন। শেখ মুজিব চাইলে তখন যে কোন মুহূর্তেই ভারতে যেতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি তাঁর অনুচরদেরকে ভারতে যাওয়ার অনুমতি দিলেও নিজের জন্য ভারতকে নিরাপদ স্থান বলে মনে করতে পারেননি।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর

এদেশ থেকে আওয়ামী লীগের যে সকল নেতা ভারতে গিয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই ভারতীয় নেতাদের কাছে তেমন গুরুত্ব পাননি। পাকিস্তান সেনা ছাউনী থেকে পলাতক সৈন্যরাও ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে অবহেলিত ছিলেন। এমনকি জেনারেল ওসমানীকেও তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়নি। গুটিকয়েক আওয়ামী লীগ নেতা এবং ছাত্র লীগের চারজন প্রাক্তন নেতা, যথা শেখ ফজলুল হক মনি, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ ও সিরাজুল আলম খানই ভারতীয় নেতাদের কাছে সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য পেয়েছেন। এই প্রাক্তন চার

www.pathagar.com

ছাত্রনেতার নেতৃত্বে যে মুজিববাহিনী গঠন করা হয়েছিল সেই বাহিনীকে ভারতীয় জেনারেলরা বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। এই বাহিনীর জন্যই ভারত থেকে উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছিল। অথচ পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে পলাতক সৈন্যদের নিয়ে বি. এল. এফ. নামক যে বাহিনী গঠন করা হয়েছিল সেই বাহিনীকে প্রয়োজনীয় অস্ত্রের অভাবে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধ চালাতে হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মুজিব বাহিনী বি. এল. এফ. থেকে চারগুণ বেশী অস্ত্র পেয়েছিল। বাহিনীটি মুজিবের নামে গঠিত হলেও তার নেতারা মুজিবের প্রতি কতটুকু অনুগত ছিলেন তা বলা মুশকিল।

স্বাধীনতার পর মুক্তি বাহিনী যখন দেশে ফিরে এল তখন দেখা গেল ভারত থেকে যে সকল অস্ত্র এসেছে তার ষাট শতাংশই মুজিববাহিনীর নিকট ছিল। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতার পর বাংলাদেশকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আওয়ামী লীগের গুটিকয়েক নেতা ও মুজিববাহিনীর চার নেতার উপরই নির্ভর করেছিলেন। শেখ মুজিব যখন পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে বাংলাদেশে ফিরে এলেন তখন তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে ঐ নেতারা অবশ্য দাঁড়াতে পারেননি। শেখ সাহেবের জনপ্রিয়তার কাছে তখন তাঁদেরকে মাথা নত করতে হয়েছিল। একমাত্র শেখ মুজিবের ব্যক্তিত্ব ও দৃঢ়তার কারণে ভারতীয় সৈন্যদেরকে বাংলাদেশের মাটি ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারী যেদিন শেখ মুজিব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে এসেছিলেন সেদিন থেকে ১৯৭৫ সালের ১৪ই আগষ্ট পর্যন্ত তাঁর নিজের কর্মীদের কাছ থেকে বাধা পাওয়ার কারণে তিনি আপন ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে পারেননি। তবে মাঝে মাঝে তিনি একগুঁয়েমী করে ভারতীয় নেতাদের কিছু কিছু উপদেশ অগ্রাহ্য করেছেন। শেখ মুজিবের কারণেই ভারতীয় নেতারা শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশকে তাঁদের দেশের অঙ্গরাজ্যে পরিণত করতে পারেননি। তাই দেখা যায়, শেখ মুজিবেরর মৃত্যু ভারতীয় মহলে এবং এদেশের ভারতীয় এজেন্টদের মধ্যে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেনি। তবুও রাজনৈতিক কারণে এসব এজেন্ট এখনও শেখ মুজিবের জন্য মায়াকান্নায় ব্যস্ত।

ভারতীয় নেতাদের অনুরূপ পাঁয়তারা এখনও অব্যাহত রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে তাঁরা বাংলাদেশে কোটি কোটি টাকা প্রতি বৎসর খরচ করছেন। এদেশের

www.pathagar.com

শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও সুধীদের পেছনে তাঁরা প্রচুর টাকা খরচ করছেন। ছাত্র ও যুবসমাজসহ বিশেষ রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদেরকেও তাঁরা বিভিন্ন পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছেন। এপার বাংলা–ওপার বাংলা এক বলে প্রচারের মাধ্যমে তাঁরা বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ শুধু বাংলাদেশেই চালু রাখতে চান। পশ্চিম বাংলায় বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের আন্দোলনের কোন অস্তিত্বই নেই। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের স্বার্থে ইসলামবিরোধী সকল আন্দোলনই এদেশে তাদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তাসহ সকল প্রকার সাহায্য পেয়ে থাকে। আমাদের প্রশ্ন, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের স্বার্থে পশ্চিম বাংলা ভারত ছেড়ে স্বাধীন বাংলাদেশের সাথে যোগ দেবে, না আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছেড়ে ভারতের সাথে যোগ দেব? আমরা ভারতে যোগ দিলে স্বাধীন বাঙ্গালী জাতি বলে বিশ্বে কোন জাতির অস্তিত্ব থাকবে কি? পশ্চিম বাংলা যদি ভারত ছেড়ে আমাদের সাথে যোগ দেয় তাহলে একটি বৃহত্তর বাঙ্গালী জাতির সৃষ্টি হতে পারে এবং সেই জাতি বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। এজন্য তো পশ্চিম বাংলাতেই বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের আন্দোলন চাঙ্গা হওয়া উচিত। আমাদের দেশে যাঁরা বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের আন্দোলন করেন এ ব্যাপারে তাদের সক্রিয় হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। নচেৎ আমাদের দেশে এ ধরণের আন্দোলনের কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। পশ্চিম বাংলা ভারত ছেড়ে আমাদের সাথে যোগ দিলে বাঙ্গালী জাতি হিসেবে পরিচয় দেয়া আমাদের পক্ষে কিছুটা যুক্তিসম্মত হতে পারে। যতদিন পশ্চিম বাংলা ভারতের সাথে থাকবে ততদিন বাঙ্গালী জাতি হিসেবে আমরা পরিচয় দিতে পারি না। তারা এসে আমাদের সাথে যতদিন যোগ না দেবে ততদিন বাংলাদেশী জাতি হিসেবেই আমরা বিশ্বের দরবারে পরিচয় তুলে ধরব। বাংলাদেশী জাতিই হবে আমাদের প্রকৃত পরিচয়। পশ্চিম বাংলাকে বাদ দিয়ে শুধু বাংলাদেশে যাঁরা বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের আন্দোলন করেন প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ভারতীয় এজেন্টের কাজই করছেন। পশ্চিম বাংলা থেকে এসে কিছু লোক এদেশে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের আন্দোলন করছেন। এঁদেরকে পরিকল্পিতভাবে এদেশে পাঠানো হয়েছে বলে মনে হয়। যদি বাঙ্গালিত্বের জন্য তাঁদের এতই দরদ হয়ে থাকে তবে তাঁরা পশ্চিম বাংলা ছেড়ে এদেশে আসলেন কেন? সেখানে কি বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ প্রচার করা যায় না? না কি মুসলমান হওয়ার দরুণ

www.pathagar.com

তাঁদের জীবিকা নির্বাহের পথ সেই দেশে রুদ্ধ ছিল? তবে কি জীবিকার অন্বেষণেই তাঁদেরকে এদেশে আসতে হয়েছে? যে সকল বাঙ্গালী নিজেদেরকে বাঙ্গালী না বলে ভারতীয় বলে পরিচয় দিতে আনন্দ পায় বস্তুতঃ তাদের মধ্যেই বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের প্রচারের প্রয়োজনীয়তা বেশী। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের ভবিষ্যতের স্বার্থে পশ্চিম বাংলায় বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ আন্দোলন চাঙ্গা করা এদেশের বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের প্রেমিকদের নিতান্ত কর্তব্য। তাঁদের কাছে এদেশের মানুষের একটি জিজ্ঞাসা, পশ্চিম বাংলায় জাতীয়তাবাদ আন্দোলন করলে তারা নিজেদের নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন কিনা?

স্বাধীনতার পর থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপ্রধান থাকলেও প্রকৃতপক্ষে দেশের বিভিন্ন কর্মকান্ডে তখন কতটুকু তাঁর নিয়ন্ত্রণ ছিল তা বলা মুশকিল। সেই সময় একশ্রেণীর আওয়ামী লীগ নেতা নেপথ্য থেকে দেশ নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। দেশ পরিচালনার ব্যাপারে তখন বঙ্গবন্ধুর সাথে তাঁদের মতের মিল ছিল না। দেশের জনগণ কিন্তু বঙ্গবন্ধুরই অনুরাগী ছিল। তাই ঐ আওয়ামী লীগ নেতারা বঙ্গবন্ধুর নামে তাঁদের সিদ্ধান্ত দেশের উপর চাপিয়ে দিতেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে এসকল নেতা একশ্রেণীর যুবকের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। ঐ যুবকদের নিয়েই তাঁরা ধীরে ধীরে তাঁদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করছিলেন। আওয়ামী লীগের এসব নেতা তখন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কাছ থেকেও প্রত্যক্ষ সহযোগিতা পেয়ে আসছিলেন। ব্যাপারটি টের পেয়ে বঙ্গবন্ধু ধীরে ধীরে তাঁর নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছিলেন। তিনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভারতের প্রাধান্য থেকে দেশকে রক্ষা করতে হলে প্রথমে আওয়ামী লীগের এ সকল নেতার প্রভাব থেকে আওয়ামী লীগকে রক্ষা করতে হবে। এজন্য তিনি রাশিয়ার একদলীয় পদ্ধতিকেই নিজের নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার উপায় হিসেবে গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতেই ১৯৭৫ সালের প্রথম দিকে জাতীয় সংসদের এক অধিবেশনে মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যেই সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী পাশ করে দেশে একদলীয় বাকশাল শাসনব্যবস্থা কায়েম করা হয়। এই 'বাকশাল' প্রতিষ্ঠাকে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সুনজরে দেখেননি। তখন থেকেই বঙ্গবন্ধুর উপর হতে ভারত তাদের সমর্থন ধীরে ধীরে প্রত্যাহার করতে শুরু করে। এদিকে বঙ্গবন্ধুও কিছু কিছু আওয়ামী

www.pathagar.com

লীগ কর্মী ও নেতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মন্তব্য করতে শুরু করেন। আওয়ামী লীগের এই সকল নেতাও বাকশালের মধ্যে ক্ষমতা দখল করে শেখ মুজিবকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন, যার ফলে একদিকে বঙ্গবন্ধুর উপর থেকে ভারতীয় ছত্রছায়া ক্রমশঃ সরে যেতে থাকে, অন্যদিকে ঐ সকল আওয়ামী লীগ নেতা এবং কর্মীও বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে দূরে সরে যেতে থাকেন। তাই বঙ্গবন্ধু তাঁর নেতৃত্বের প্রতি সমর্থনজনিত এ শূন্যতা পূরণ করার উদ্দেশ্যে প্রতি মহকুমাকে জেলা করে প্রত্যেক জেলায় গভর্ণর নিয়োগের প্রথা চালুর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুর ইচ্ছা ছিল গভর্ণর প্রথা চালু করার পর তিনি স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হবেন। কিন্তু নিয়তির ইচ্ছা ছিল অন্য রকম। ঐ গভর্ণর প্রথা চালু হওয়ার পূর্বেই এক সামরিক অভ্যুত্থানে বঙ্গবন্ধু নিহত হন এবং আওয়ামী লীগ কার্যতঃ ক্ষমতাচ্যুত হয়। বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে ১৫ই আগষ্ট যে সামরিক অভ্যুত্থান হয় তাকে প্রতিহত করার কোন ব্যবস্থাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। কারণ তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার দেশের গোয়েন্দা বিভাগকে অত্যন্ত দুর্বল করে রেখেছিলেন। তাঁরা তখন এসব ব্যাপারে ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগের উপরই নির্ভর করতেন। বাকশাল প্রতিষ্ঠার পর থেকে ভারতীয় নেতারা বঙ্গবন্ধুর ব্যাপারে একটু উদ্যসীনতা দেখাচ্ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তার ব্যাপারে তখন তাঁরা তেমন মাথা ঘামাননি। আর আওয়ামী লীগের যে অংশটুকু মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে অত্যন্ত সক্রিয় ছিল, তাঁরাও ধীরে ধীরে তখন বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলেন। ফলতঃ যে গুটিকয়েক সামরিক কর্মকর্তা বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তাঁরা তখন নিরাপদেই তাঁদের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পান। এখানে বিশেষভাবে আরো লক্ষণীয় যে, বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর ভারত কিংবা আওয়ামী লীগের কাছ থেকে জোরালো কোন প্রতিক্রিয়াও দেখা যায় নি।

পনরই আগষ্টের বিপ্লবের নেতারা দেশপ্রেম ও ইসলামের কথা যতই বলুননা কেন, তাঁদের এই বিপ্লবের পেছনে ক্ষমতার মোহ যে ছিলনা তা বলা খুবই কঠিন। তাঁরা জানতেন যে, দেশের জনগণের কাছে তাঁরা যেমন অপরিচিত, তেমনি সেনাবাহিনীর কাছেও তাঁরা অগ্রহণযোগ্য। তাই তাঁরা রাজনীতির ক্ষেত্রে পরিচিত খন্দকার মোশতাক আহমদকে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান এবং মেজর জেনারেল

www.pathagar.com

জিয়াউর রহমানকে সেনাপ্রধান করেছিলেন। অবশ্য একজনকে রাষ্ট্রপ্রধান ও আরেকজনকে সেনাপ্রধান করলেও তাঁদের কারও উপরেই পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে পারেননি বিপ্লবের নায়কেরা। তাঁরা বঙ্গভবনে বসে নেপথ্য থেকে দেশের বিভিন্ন বিষয় নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। এই ব্যাপারটি খন্দকার মোশতাক আহমদ ও জেনারেল জিয়াউর রহমান কেউই সহজভাবে নেননি, যার ফলে বিপ্লবের নেতারা রাজনৈতিক মহলে ও সেনাবাহিনীর কাছে নিজেদেরকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারেননি। তাঁরা নিজেদেরকে ভারতবিরোধী বলে প্রচার করলেও তখন ভারতে প্রশিক্ষণরত ব্রিগেডিয়ার হোসেন মুহম্মদ এরশাদকে পদোন্নতি দিয়ে মেজর জেনারেল করে সহকারী সেনাপ্রধান হিসেবে নিয়োগ দান করেন এবং এতে জনগণের মধ্যে সন্দেহ দেখা দেয়। কেউ কেউ মনে করেন ভারতের বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রতিহত করার জন্যই এই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, জেনারেল এরশাদকে সহসেনাপ্রধান করার পরও তাঁকে ভারতে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য রেখে দেয়া হয়। এক দিকে বলা হচ্ছে ভারত আমাদের দিকে 'হায়েনার দৃষ্টিতে' তাকিয়ে আছে, আবার অন্যদিকে সেই 'হায়েনার' নিকটই আমাদের সহসেনাপ্রধানকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য রেখে দেয়া হল। জেনারেল এরশাদ সহসেনাপ্রধান নিযুক্ত হওয়ার পরও ভারতে দেড়টি বছর পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করেন। এই দেড় বছরের মধ্যে ভারতীয় সেনাপতিরা তাঁর মগজ কতটুকু ধোলাই করেছেন তা ১৫ই আগষ্টের বিপ্লবের নেতারা কি জানেন?

বিপ্লবের নেতারা বঙ্গভবনে বসে নেপথ্য থেকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করলেও সেনাবাহিনীর কাছে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির প্রতি মোটেই নজর দেননি, ফলে সেনাবাহিনীর সিনিয়র অফিসাররা ক্রমে তাঁদের প্রতি বিরক্ত হয়ে উঠেন। এমন কি তখন সেনাবাহিনী সামলানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমানের সাথেও তাঁরা সুসম্পর্ক বজায় রাখেননি, যার ফলশ্রুতিতে ঐ বৎসরই বিপ্লবের আশি দিন পর ৩রা নভেম্বর দেশে একটি প্রতিবিপ্লব সংঘটিত হয়। এই প্রতিবিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ। প্রথমে খালেদ মোশাররফের প্রতি জেনারেল জিয়ারও সমর্থন ছিল। কিন্তু যখন খালেদ মোশাররফ নিজেকে সেনাপ্রধান হিসেবে ঘোষণা দেন তখন জেনারেল জিয়াউর রহমান বিকল্প চিন্তা শুরু করেন।

www.pathagar.com

জেনারেল জিয়াউর রহমানের বিকল্প চিন্তার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী সহযোগিতা এসেছিল যশোর ক্যান্টনমেন্টের মেজর জেনারেল মীর শওকত আলী এবং চট্টগ্রাম ক্যান্টেনমেন্টের মেজর জেনারেল দস্তগীরের কাছ থেকে। এই দুই মেজর জেনারেলের সক্রিয় সহযোগিতাতে ৭ই নভেম্বর যে 'ঐতিহাসিক সিপাহী জনতার বিপ্লব' সাধিত হয় তার ফলশ্রুতিতেই জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ৩রা নভেম্বরের সেনা অভ্যুত্থানের পরে ৪ঠা নভেম্বর সকাল বেলা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে মুজিব হত্যার প্রতিবাদে একটি মিছিল বের করা হয়। এই মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন খালেদ মোশাররফের মাতা। এতে জনসাধারণ ও সিপাহীদের মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, খালেদ মোশাররফ হলেন ভারতপন্থী। অথচ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ প্রকৃতপক্ষে ভারতপন্থী ছিলেন না। খালেদ মোশাররফের ভাই রাশেদ মোশাররফ ছিলেন আওয়ামী লীগের এম, পি। তিনিই তাঁর মাতাকে আওয়ামী লীগের মিছিলে এনেছিলেন। রাশেদ মোশাররফের এই ভুলের জন্য ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে সিপাহীদের হাতে চরম পরিণতি ভোগ করতে হয়–তাঁকে এই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিতে হয়।

৩রা নভেম্বরের প্রতিবিপ্লবের সময় ক্ষমতা দখলের একটি ব্যর্থ চেষ্টা জাসদ নেতা কর্ণেল তাহেরও চলিয়েছিলেন। তিনি তাঁরই সৃষ্ট 'গণবাহিনীর' মাধ্যমে জেনারেল জিয়াকে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের করে এনে তাঁকে ব্যবহার করে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেন। কিন্তু মেজর জেনারেল শওকতের দূরদর্শিতার কারণে জেনারেল জিয়াকে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বাইরে আনা কর্ণেল তাহেরের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এরপর ৯ এবং ১০ই নভেম্বর কর্ণেল তাহেরের নির্দেশে 'গণবাহিনীর' হাতে জেনারেল জিয়ার সমর্থক বেশ কিছু সেনাঅফিসার নিহত হন। সামরিক বাহিনীতে অফিসারদের একজন করে সাধারণ সৈনিক রাখার যে 'ব্যাট্‌ম্যান' প্রথা চালু ছিল, সাধারণ সৈনিকদেরকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য গণবাহিনীর নেতৃত্বে সেই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে তা রহিত করার প্রয়াস চালানো হয়। জেনারেল জিয়া অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে গণবাহিনীর সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যার মোকাবেলা করেন। তাঁর দৃঢ় নেতৃত্বের ফলে ধীরে ধীরে সেনাবাহিনী থেকে গণবাহিনী সদস্যদের উচ্ছেদ করার ব্যবস্থা করা হয়। কর্ণেল

www.pathagar.com

তাহেরের নেতৃত্বে যে গণবাহিনীর সৃষ্টি হয়েছিল তা যদি এখনও সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে টিকে থাকত তবে বর্তমানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিশ্বে যে ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছে তা কোনদিন সম্ভব হত না।

জেনারেল জিয়া তিন বৎসরের অধিক কাল সামরিক শাসন চালাবার পর ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দেশে এক সাধারণ নির্বাচন দেন। এনির্বাচনের পর দেশে গণতন্ত্র ফিরে আসে। এই গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে ১৯৮১ সালের ৩০শে মে এক সেনাবিদ্রোহে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে জেনারেল জিয়া নিহত হন। তবে জেনারেল জিয়াকে ক্ষমতাচ্যুত করার উদ্দেশ্যে সামরিক অভ্যুত্থানের ঐ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়নি বলে শোনা যায়। উদ্যোক্তারা চেয়েছিলেন জেনারেল জিয়াকে অপহরণ করে তাঁর মাধ্যমে দেশের নির্বাচিত সংসদকে বাতিল ঘোষণা করে তাঁরই নেতৃত্বে একটি বিপ্লবী সরকার গঠন করতে। কিন্তু ঐ দলে দুজন সেনা অফিসার ভিন্ন মতলবে অন্য কারো গুপ্তচর হিসেবে ঢুকে পড়েছিলেন। ঐ রাত্রে তাঁরাই জেনারেল জিয়াকে লক্ষ্য করে ব্রাশফায়ার শুরু করে দেন যার ফলে তিনি নিহত হন। বিপ্লবী সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে যাঁরা জিয়াকে অপহরণ করতে গিয়েছিলেন সেই সেনাদলটি জেনারেল জিয়া হত্যায় হতভম্ব হয়ে পড়েন। যে দুইজন সেনা অফিসার জেনারেল জিয়াকে হত্যার জন্য দায়ী তাঁরা তখনই দল ছেড়ে পালিয়ে যান। প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবী সরকার গঠনের মূল পরিকল্পনা ছিল চট্টগ্রাম অঞ্চলের তৎকালীন জি. ও. সি. মেজর জেনারেল মন্‌জুরের। তিনি কিন্তু ঐ অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার সাথে জড়িত ছিলেন না। তাঁর দলীয় সেনা অফিসাররাই সেদিন তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে ঐ প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। যেহেতু তাঁর দলীয় লোকেরাই ঐ প্রচেষ্টার সাথে জড়িত ছিলেন, সেহেতু তিনি এগিয়ে এসে পরিস্থিতি সামাল দেবার চেষ্টা করেন। ঢাকা সেনা হেডকোয়ার্টারের সাথে যোগাযোগ করে তিনি মেজর জেনারেল মীর শওকতের সাথে কথা বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জেনারেল মীর শওকত তাঁর সাথে কথা বলতে রাজী হননি। পক্ষান্তরে তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল এরশাদের সাথেও জেনারেল মন্‌জুরের সম্পর্ক মোটেই ভাল ছিল না। তাই তিনি জেনারেল এরশাদের সাথে এ ব্যাপারে কোন কথা বলতে রাজী ছিলেন না। এদিকে জেনারেল মীর শওকত তাঁর সাথে কথা না বলায় তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে পড়েন। এরপর তিনি অর্থাৎ

www.pathagar.com

জেনারেল মন্‌জুর এক ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। তিনি দেশের শাসনক্ষমতা নিজ হাতে নেয়ার ঘোষণা দিয়ে রেডিওতে এক ভাষণ দেন। এই রেডিও ভাষণের ফলে জনসাধারণ জেনারেল মন্‌জুরকেই জিয়া হত্যার জন্য দায়ী বলে ধরে নেয়। তাঁর এই ভুল সিদ্ধান্তের কারণে তিনি তাঁর নিজের লোকদেরকে তো রক্ষা করতে পারলেনই না, বরং নিজেও প্রাণ দিলেন। জেনারেল মন্‌জুর যদি দেশের শাসনক্ষমতা নিজ হাতে নেয়ার ঘোষণা না দিয়ে যাঁরা জেনারেল জিয়াকে অপহরণের চেষ্টা করেছিলেন তাঁদেরকে গ্রেফতার করতেন তবে তিনি নিজেকে তো নিরপরাধ প্রমাণ করতে পারতেনই, এমনকি জেনারেল জিয়া হত্যার সঠিক তথ্য উদঘাটন করে পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর নিজের লোকদেরকেও রক্ষা করতে পারতেন। সরকারের প্রতি অনুগত সেনা অফিসারদের প্রচেষ্টার কারণে জেনারেল মন্‌জুরের ক্ষমতা দখলের চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই গ্রেফতার হয়ে সেনাবাহিনীর হেফাজতে থাকা অবস্থাতেই নিহত হন। আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই যে, সেনাবাহিনীর হেফাজতে থাকা অবস্থায় জেনারেল মনজুর নিহত হলেও সেনাবাহিনী কিন্তু তাঁর মৃত্যুর জন্য কে বা কারা দায়ী তার তেমন খোঁজখবরই নিল না। পরবর্তী সময়ে সেনাবাহিনীর উদ্যোগে জিয়া হত্যার সাথে জড়িতদেরকে কোর্ট মার্শালের মাধ্যমে ফাঁসি দেয়া হয়। এ হত্যার জন্যে যাঁরা সরাসরি দায়ী নন তাঁরাই এতে শাস্তি পান। জিয়া হত্যার জন্য যে দুজন সেনা অফিসার সরাসরি দায়ী তাঁরা পলাতকই রয়ে গেলেন। এ হত্যার সঠিক তথ্য জনসাধারণ জানতেই পারল না।

জিয়া হত্যার পর ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সাথে সাথে বি. এন. পি'র মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। যার ফলে তৎকালীন বি,এন,পি সরকার জেনারেল জিয়া হত্যার ব্যাপারে সঠিক কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নি। বি. এন. পি–এর একটি গ্রুপ তখন আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য বেগম খালেদা জিয়াকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেয়ার পরিকল্পনা করে। বি. এন. পি'র অন্তর্ভুক্ত প্রাক্তন সেনা অফিসাররাই এই গ্রুপের নেতৃত্বে ছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল বেগম জিয়াকে ক্ষমতায় বসিয়ে তাঁরাই নেপথ্য থেকে দেশ পরিচালনা করবেন। বিচারপতি সাত্তার তাতে রাজী ছিলেন না। দুঃখের বিষয়, জিয়া হত্যার সঠিক তথ্য উদঘাটনের জন্য বিচারপতি

www.pathagar.com

সাত্তারের যখন বেগম জিয়ার সমর্থনের বিশেষ প্রয়োজন ছিল তখন কিন্তু বেগম জিয়া বিচারপতি সাত্তারের পাশে এসে দাঁড়াননি। বি. এন. পি র এই অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণেই বিচারপতি সাত্তারের পক্ষে জিয়া হত্যার রহস্য উদঘাটন ও বিচারের ব্যাপারে সঠিক পদক্ষেপ নেয়া সম্ভবপর হয়নি। আমাদের মনে হয়, বি. এন. পি'র এই অন্তর্দ্বন্দ্বই ১৯৮২ সালের মার্চ মাসে জেনারেল এরশাদকে সামরিক শাসন ঘোষণা করতে সাহস জুগিয়েছিল।

জেনারেল এলশাদ ১৯৮২ সালে সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে প্রায় পৌনে নয় বছর দেশ চালান। ক্ষমতায় থাকাকালে তিনি দেশকে যেভাবে পরিচালনা করেছেন তা সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তাঁর এই পৌনে নয় বছরের শাসনামলে জাতির যা পাওয়ার ছিল তা পায়নি, জাতি হিসেবে বেঁচে থাকতে হলে আমাদের যেসব ক্ষেত্রে অগ্রগতির বিশেষ প্রয়োজন ছিল আমরা সেই সকল ক্ষেত্রে দিনের পর দিন পিছিয়ে গিয়েছি। আমাদের দেশে ১৯৮২ সালের পূর্বে অস্ত্রের ঝনঝনানি ও বিশেষ ধরণের সন্ত্রাস আমরা দেখিনি। শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের প্রেক্ষিতে তাদের বেতনবৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন কলকারখানা লোকসানের সম্মুখীন হয়ে প্রায় বন্ধের দিকে গিয়ে দাঁড়ায়। আমাদের যে সোনালীতন্তু পাট একদিন তার গুণগত মান ও স্বল্পমূল্যের কারণে বিশ্ববাজার দখল করে নিয়েছিল সেই পাট ধীরে ধীরে বিশ্ববাজার হারাতে শুরু করল। লোকসানের ভয়ে শিল্পক্ষেত্রে নতুন নতুন পুঁজি বিনিয়োগ একপ্রকার বন্ধই হয়ে গেল। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বৃদ্ধির কারণে শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা অনেকটা পিছিয়ে গেলাম। ব্যবসা–বাণিজ্যে এবং বিভিন্ন সরকারী অফিসে দুর্নীতি এত বেড়ে গেল যে, সর্বক্ষেত্রেই জনগণ তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে লাগল। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে উপরের মহলে কমিশন দেয়া–নেয়ার কারণে কাজের মান অত্যন্ত নিম্নস্তরে চলে গেল। এর ফলে আমাদের জাতীয় চরিত্রের চরম অবনতি ঘটতে লাগল। এরশাদের শাসনামলে ১৯৮৬ এবং ১৯৮৮ সালে দেশে দু'দুবার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। ১৯৮৬ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি নিজেকে দেশের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেন। বস্তুতঃ এই ধরণের নির্বাচনকে 'পাতানো নির্বাচনই' বলা চলে। এসব নির্বাচন ছিল গণতন্ত্রের নামে সত্যিকারভাবে দেশ থেকে গণতন্ত্রকে নির্বাসন দেয়ারই একটা

www.pathagar.com

মহড়া বিশেষ। ১৯৮৮ সালের নির্বাচনের পর তৎকালীন জাতীয় সংসদে জেনারেল এরশাদের অত্যন্ত অনুগত কিছু লোক নিয়েই এক নজরিবিহীন বিরোধীদল তৈরী করা হল। জাসদ নেতা আ. স. ম. আবদুর রব ঐ বিরোধীদলের নেতৃত্ব দেন।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা গ্রহণের অল্প কিছুদিন পরেই ভারত বাংলাদেশ থেকে তাদের রাষ্ট্রদূত মুচকুন্দ দুবে'কে সরিয়ে তৎস্থলে আরেকজন নতুন রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করে। ঐ নতুন রাষ্ট্রদূত নাকি দেরাদুনে জেনারেল এরশাদের প্রশিক্ষক ছিলেন। জেনারেল এরশাদকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়ার জন্যই ঐ নতুন রাষ্ট্রদূতকে ঢাকায় নিয়োগ করা হয়। জাতি হিসেবে আমাদেরকে ক্রমান্বয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য পরামর্শ প্রদানই হয়তো তাঁর দায়িত্ব ছিল। আমরা যখন প্রায় ধ্বংসের শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছলাম তখনই ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে এক ব্যাপক গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতাচ্যুত হন।

তখন সকল প্রধান রাজনৈতিক দলের ইচ্ছার ভিত্তিতে জেনারেল এরশাদ সুপ্রীম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি শাহাবউদ্দিনকে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিযুক্তি দিতে বাধ্য হন। অতঃপর জেনারেল এরশাদকে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ইস্তফা দিতে হয়। ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবউদ্দিন ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে তখন একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করেন। এখানে একটি বিষয় আমাদের বোধগম্য হয়না, প্রধান বিচারপতি সরকারী চাকরী থেকে পদত্যাগ না করা পর্যন্ত ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর নিযুক্তি কি করে আইনসম্মত হয়? প্রধান বিচারপতিই বা কি করে ঐ বেআইনী নিযুক্তির ভিত্তিতে শপথ গ্রহণ করেন? এই ধরণের শাসনতান্ত্রিক বিধি অমান্য করার কারণে আকাঙ্ক্ষিত গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। পরবর্তীতে জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতভাবে একটি আইন পাশ করে ঐ আইনকে পূর্ব থেকে কার্যকর করার মাধ্যমে বিচারপতি শাহাবউদ্দিনকে আবার প্রধান বিচারপতি হিসেবে গ্রহণ করে নেয়া আইনের দৃষ্টিতে কতটুকু সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল সেটাও ভেবে দেখা প্রয়োজন। এসব দেখে মনে হয় সংবিধানের প্রতি রাজনৈতিক নেতাদের কোন প্রকার শ্রদ্ধাবোধ নেই।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ মনে করেন যে, দেশের জনগণকে ক্ষেপিয়ে আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁরা নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। জনগণ রাজনৈতিকভাবে সচেতন না হওয়ার কারণেই আমাদের রাজনৈতিক নেতারা এ ধরণের কাজের সুযোগ পাচ্ছেন। যে দেশের উচ্চ রাজনৈতিক পর্যায়ে শাসনতন্ত্রকে অবহেলা করা হয় সে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

বিচারপতি শাহাবউদ্দিন যে 'তত্ত্বাবধায়ক' সরকার গঠন করেছিলেন সেটাকে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার হিসেবে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ঐ সরকারের মন্ত্রীদেরকে নির্দলীয় বলা গেলেও কোন অবস্থাতেই তাঁদেরকে নিরপেক্ষ বলা যায় না। কারণ তাঁদের মধ্যে বেশীর ভাগ মন্ত্রীই বিশেষ একটি মতাদর্শের গোঁড়া সমর্থক ছিলেন। তাঁরা ক্ষমতায় যতদিন ছিলেন ততদিন তাঁদের মতাদর্শ প্রচারের কোন রকম ত্রুটি করেননি। এমন কি ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি তাঁর নিজস্ব মতাদর্শ প্রচারে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। তবে এটা সত্য যে, তাঁরা কেউই নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করার জন্য কোন চেষ্টা করেননি। তাঁরা প্রায় সকলেই এ ব্যাপারে আস্থাশীল ছিলেন যে, তাঁদের মতাদর্শের বিশ্বাসী দলই দেশে নির্বাচনোত্তর সরকার গঠন করতে যাচ্ছে। কিন্তু তাঁরা এদেশের মানুষ সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে সক্ষম হননি। কারণ এদেশের মানুষ তাঁদের মতাদর্শের সমর্থক নয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সন্ত্রাসের মাধ্যম বেশ কিছু আসন দখল করলেও তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন থেকে বেশ পিছিয়ে পড়ে। নির্বাচনের মাধ্যমে দেখা গেল যে, এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ইসলামী আদর্শের উপরই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। নির্বাচনের সময় যাঁরা ইসলামের কথা যত দৃঢ়ভাবে জনগণের কাছে তুলে ধরেছেন তাঁরাই জনগণের কাছ থেকে তত অধিক সমর্থন পেয়েছেন। যদিও বি. এন. পি. ইসলামী আন্দোলনের প্রতি প্রতিশ্রুত নয় তবুও তাঁরা নির্বাচনের সময় ইসলামের মৌলিক ব্যাপারগুলোর প্রতি তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাসের কথা জনগণের কাছে জোর গলায় বলেছেন। তাই বি. এন. পি. জনগণের সমর্থনে নির্বাচনে বৃহত্তম দল হিসেবে বিজয়ী হয়ে উঠে আসে। দু'একটি ইসলামী দল নির্বাচনে অংশ নিলেও দলীয়ভাবে দেশ চালানোর যোগ্যতা সম্পর্কে জনগণের সন্দেহ থাকায় নির্বাচনে

www.pathagar.com

সাফল্য লাভ করতে তারা পারেনি। বি. এন. পি. বৃহত্তম দল হিসেবে বেরিয়ে আসলেও প্রথম পর্যায়ে তারা কিন্তু একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। তারা ৩০০ আসনের মধ্যে ১৪০ টি আসন লাভ করেছিল। ত্রিশটি মহিলা আসনের নির্বাচন তখনও বাকী ছিল। এমতাবস্থায় বি. এন. পি. সরকার গঠন করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তাদেরকে সরকার গঠনের সুযোগ দেয়ার জন্য সংসদের ১৮টি আসন দখলকারী জামায়াতে ইসলামী তাদের সমর্থন নিয়ে এগিয়ে আসে। এই সমর্থনের বিনিময়ে জামায়াতে ইসলামী দুটি মহিলা আসন পাওয়ার ব্যবস্থা করে নেয়। মহিলা আসনগুলোর নির্বাচনের পূর্বেই সরকার গঠন করার জন্য বি. এন. পি. কেন যে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল তা বোঝা মুশকিল। মহিলা আসনের নির্বাচনের পরে সরকার গঠন করলে বি. এন. পি. একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে সরকার গঠন করতে পারত। নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পূর্বে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টই–বা কেন বি. এন. পি. কে সরকার গঠনের জন্য আহবান জানালেন তাও বোঝা কঠিন। অনেকেই বলেন যে, তাঁকে পুনরায় প্রধান বিচারপতির পদে ফিরে যেতে দেয়া হবে এই আশ্বাস পাওয়ার পরই নাকি তিনি বি. এন. পি'কে সরকার গঠন করতে আহবান করেছিলেন।

বি. এন. পি. নির্বাচনের সময় ইসলাম ও ভারত সরকার সম্পর্কে জনগণকে যে ধারণা দিয়েছিল, দেশের সরকার গঠন করার পর বি. এন. পি. তার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখেছে বলে মনে হয় না। তাদের শাসনামলে এদেশে ইসলাম বিরোধী তৎপরতা যেন বেড়ে গেছে। ইসলামবিরোধী তৎপরতা ব্যাহত করার পরিবর্তে সরকার যেন পরোক্ষভাবে তাদেরকে সহযোগিতাই দিয়ে আসছেন। কিছু কিছু পত্র–পত্রিকার ইসলামবিরোধী ভূমিকা, কিছু চিহ্নিত বুদ্ধিজীবীর ইসলামবিরোধী তৎপরতার বিরুদ্ধে সরকারের নিষ্ক্রিয়তা এবং তাঁদের প্রতি সরকারের পরোক্ষ সহায়তা জনগণকে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করে তোলে। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বিরোধীদল সরকারের বিরুদ্ধে সম্মিলিত কর্মসূচীর ভিত্তিতে এক আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলনই পরবর্তী পর্যায়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। বস্তুতঃ আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী– এই তিনটি বিরোধী দলের যৌথ উদ্যোগের এই আন্দোলন দেশের সংসদীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে এক সংকটের সৃষ্টি করে। তারা যৌথভাবে

www.pathagar.com

দাবী করে যে, নির্বাচনের ৯০ দিন পূর্বেই ক্ষমতাসীন দলকে পদত্যাগ করতে হবে এবং দেশে একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে হবে। বি. এন. পি. ক্ষমতায় থাকলে এই বিরোধীদলগুলো কোন নির্বাচনেই অংশ গ্রহণ করবে না। প্রথমে তারা দাবী করেছিল যে, সরকারী দল একটি নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকারের মাধ্যমে নির্বাচনের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধনের জন্য সংসদে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করলেই তারা সংসদে যোগ দেবে। এর অর্থ হলো সংখ্যালঘিষ্ঠ বিরোধী দলের দাবী যদি সরকার না মানেন তবে তারা সংসদকে অকার্যকর করে দেবে। এ ধরণের দাবী সংসদীয় গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ পরিপন্থী বলে বি. এন. পি. তা অগ্রাহ্য করেছে। কিছুদিন পর বিরোধীদলের ১৪৭ জন সংসদ সদস্য একযোগে পদত্যাগ করেন। তাঁদের পদত্যাগের ফলে সংবিধান সংশোধনের আর কোন সুযোগই রইল না। বিরোধী দলগুলোর এ আন্দোলন সম্পূর্ণই গণতন্ত্রবিরোধী। গণতন্ত্রে সরকারী দলের জন্য যেমন বিধিমালা রয়েছে, ঠিক তেমনি বিরোধী দলের জন্যও সেরূপ বিধিমালা রয়েছে। সরকারীদল যদি সেই বিধিমালা না মানে তাহলে যেমন গণতন্ত্র অচল হয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি বিরোধী দলও যদি তাদের বিধিমালা না মানে তাহলেও গণতন্ত্র অচল হয়ে পড়ে। আমাদের দেশে রাজনীতি সচেতন নির্দলীয় লোক পাওয়া গেলেও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ লোক পাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া সরকারী দল ও বিরোধী দল উভয়ের কাছে গ্রহণযোগ্য নিরপেক্ষ লোক পাওয়া মোটেই সম্ভব নয়। তাই বিরোধীদলের দেয়া শর্তগুলো যেন এদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রকেই অচল করে তুলছে। যদি তারা তাদের দাবী না মানা পর্যন্ত নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে না একথা না বলত তবে ১৪৭ জন সংসদ সদস্য পত্যাগ করার পর সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে শাসনতন্ত্রের বিধান মতে সাধারণ নির্বাচন দেয়া ছাড়া সরকারের আর কোন উপায় থাকত না। কিন্তু সরকার যদি সেই পথ গ্রহণ করেন তবে দেশে একটি শাসনতান্ত্রিক সমস্যা দেখা দেবে। কেউ কেউ বলছেন যে, এখন সকলে একমত হয়ে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে নির্বাচন সম্পন্ন করার পর ভবিষ্যৎ জাতীয় সংসদে একটি প্রস্তাব এনে তাকে বৈধতা দেয়া যাবে। যদি তা-ই হয় তবে অতীতের মত দেশে সামরিক শাসন জারি করে কিছুদিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করার পর নতুন জাতীয় সংসদে ঐ সামরিক শাসনকে বৈধতা

www.pathagar.com

দিলেই ত হয়। দেশের রাজনৈতিক নেতাদের খামখেয়ালির কারণে এ ধরণের গোঁজামিলের কথা যাঁরা বলেন তাঁদেরকে দেশপ্রেমিক হিসেবে জনগণ স্বীকার করে নিতে পারে কি?

দেশের শাসনতান্ত্রিক রূপ কি হবে এ ব্যাপারে ব্যাপক আলোচনা ও পর্যালোচনার পর কত ভেবেচিন্তে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে ১৯৯১ সালে শাসনতন্ত্র সংশোধন করে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করা হল। শাসনতন্ত্র সংশোধনের মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্রে উত্তরণের এই পর্যায়ে জামায়তে ইসলামী তাদের ভাষায় দেশে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে পনর বছরের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব করে। বস্তুতঃ এ ধরণের প্রস্তাব ছিল সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিপন্থী। আর এ প্রস্তাব সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিপন্থী বলেই আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টিসহ বাকী সকল দলই তখন ঐ প্রস্তাবে সমর্থন দেয়নি। এখানে একটি ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এখন বি. এন. পি. ছাড়া সকল বিরোধী দলই নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবী জানাচ্ছে। যাঁরা ১৯৯১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিপন্থী বলে মনে করতেন তাঁরা এখন দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র থাকা অবস্থায় কি করে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার চাচ্ছেন তা বোঝা মুশকিল। বস্তুতঃ এ ধরণের দাবী রাজনৈতিক দলগুলোর সুবিধাবাদী মানসিকতাকেই প্রতিষ্ঠিত করে–দেশ,জাতি এবং গণতন্ত্র এখানে অত্যন্ত গৌণ বিষয় হয়ে পড়ে। আর তাই যে সকল দল বা নেতা নিজেদের সুবিধার জন্য মত পরিবর্তন করে, শাসনতন্ত্রের প্রতি তাঁদের কতটুকু শ্রদ্ধা আছে এবং তাঁরা সংসদীয় গণতন্ত্রই বা কতটুকু সমর্থন করেন তা জনগণের ভেবে দেখা উচিত। গণতন্ত্রে নির্বাচনের সময় ক্ষমতাসীন সরকার পদত্যাগ করে থাকে। রাষ্ট্রপ্রধান তখন তাঁদেরকে নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে কাজ চালিয়ে যেতে অনুরোধ করেন। আর এই সময়টুকুতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে তাঁদের ক্ষমতাও থাকে সীমিত। প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচন কমিশনই নির্বাচন পরিচালনা করে থাকে। নির্বাচনের ব্যাপারে ক্ষমতাসীন সরকারের বিশেষ কোন দায়িত্বই থাকে না। এক্ষেত্রে বিরোধীদলগুলো যদি মনে করে যে, ক্ষমতাসীন দল নির্বাচনে তাদের প্রভাব খাটিয়ে নিজেদের দলীয় লোককে বিজয়ী করার চেষ্টা করবে তবে

www.pathagar.com

আইনের মাধ্যমে কি করে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা আরো বাড়ানো যায় এবং ক্ষমতাসীন সরকারের ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধের জন্য কি কি ব্যবস্থা নেয়া যায় সে ব্যাপারে তাদের চিন্তা করা উচিত। বিরোধী দলের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে সেই ধরণের আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করা। আর এটাই হচ্ছে একটি গণতান্ত্রিক দেশের বিরোধী দলের করণীয় কাজ। অথচ আমাদের দেশের বিরোধী দলগুলো তা না করে গণতন্ত্রের স্বীকৃত প্রথাগুলোকে অস্বীকার করে দেশে নতুন নতুন সংকট সৃষ্টির অব্যাহত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বীকৃত প্রথার প্রতি ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দল যদি শ্রদ্ধাশীল না হয় তবে সংসদীয় গণতন্ত্র অচল হয়ে পড়তে বাধ্য। একথা বলতে আমার দ্বিধা নেই যে, আমাদের দেশে সরকারী ও বিরোধী উভয় দলই সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়।

বিশ্বের তাবৎ আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি পর্যালোচনা করলে এ সত্যই প্রতিষ্ঠিত হয় যে, সমচিন্তায় বিশ্বাসীরা যদি কোন আন্দোলনে একত্রে কাজ করে তবে আন্দোলন সফল হওয়ার পরে তার সুফল পাওয়া যেতে পারে। আর যদি মৌলিক চিন্তাধারার সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থিত দলের সমন্বয়ে কোন আন্দোলনের সৃষ্টি হয় তবে সেই আন্দোলন সফল হলেও তার সুফল দেশ বা জনগণ ভোগ করতে পারে না। কারণ আন্দোলনের সফলতার পর ঐ সকল দল তাদের নিজ নিজ পথেই চলতে শুরু করে। উদাহরণ স্বরূপ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয়ের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই বিপুল বিজয় কিভাবে নস্যাৎ হয়ে গিয়েছিল তার ইতিহাস ত আমাদের সামনেই রয়েছে। এবারকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার আন্দোলনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কেননা এআন্দোলনের পুরোভাগে যে তিনটি দল রয়েছে তারা প্রত্যেকেই বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে। এরা অতীতে একে অন্যের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলনে জড়িত ছিল। এখনও একে অন্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সক্রিয় রয়েছে। তাই এ আন্দোলন দেশে বিশৃঙ্খলা আনয়ন ও অরাজকতা সৃষ্টি করা ছাড়া দেশের কি উপকার সাধন করবে তা বুঝে উঠা মুশকিল।

নব্বই দশকের শুরুতে প্রায় দুর্ভেদ্য রুশ সমাজতান্ত্রিক দুর্গে যখন ধস নামা শুরু হয় এবং রাশিয়ার বিভিন্ন প্রজাতন্ত্র ইউ. এস. এস. আর. থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন রাশিযা নিজেদের সমস্যা মোকাবেলার উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্যের ধনতান্ত্রিক

www.pathagar.com

শক্তির কাছে মাথা নত করে। ফলতঃ তখনই বিশেষ স্নায়ুযুদ্ধের অবসান সূচিত হয়। স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর থেকে পাশ্চাত্যের ধনতান্ত্রিক দেশগুলো ইসলামকে আদর্শের দিক হতে তাদের আগামী প্রজন্মের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখতে থাকে। তাই তারা বিশ্বের দিকে দিকে যেখানেই ইসলামের সত্যিকার মতবাদ প্রচার হয় সেখানেই অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে তার বিরোধিতায় নেমে পড়ে। বাংলাদেশের প্রতিও তখন থেকেই তাদের শ্যেনদৃষ্টি পড়তে শুরু করে। তারা এদেশের ইসলামবিরোধী শক্তিগুলোকে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে আসছে তখন থেকেই। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতও ইসলামবিরোধিতার কাজে পিছিয়ে নেই। পাশ্চাত্য শক্তি এবং ভারত ইসলাম বিরোধিতার কাজে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রসংগে জনৈকা বাংলাদেশী লেখিকা তসলিমা নাসরিনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারতীয়দের প্ররোচনায় অত্যন্ত নীচু মানের এই বাংলাদেশী লেখিকা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় স্বার্থবিরোধী 'লজ্জা' নামক একটি উপন্যাস রচনা করেন। এই মহিলা সাহিত্যিক কোলকাতার একটি ইংরেজী দৈনিকে এক সাক্ষাৎকার প্রদান করে ইসলামবিরোধী ভারত ও পাশ্চাত্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তসলিমা নাসরিনের এসব রাষ্ট্রবিরোধী এবং ইসলামবিরোধী তৎপরতার বিরুদ্ধে যখন বাংলাদেশের মুসলমানদের কাছ থেকে প্রতিবাদ উঠে তখন ভারত ও পাশ্চাত্য দেশসমূহ শিল্পী সাহিত্যিকের মত প্রকাশের অধিকারের কথা তুলে একযোগে তাঁর প্রতি সমর্থন দিতে শুরু করে। এসব মানবাধিকারবাদী (!) দেশগুলো কিন্তু ভুলে যায় যে, অপরের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়া মানবাধিকারের সম্পূর্ণ বিরোধী। এটা হল তাদের সর্বশেষ ইসলামবিরোধী কাজের নমূনা। তসলিমা নাসরিনের সাহিত্যকর্ম গুণগত মানের দিক থেকে ছিল অত্যন্ত নীচু মানের। এসব লেখা শিল্পসম্মতও ছিল না। ফলে তার প্রভাব এদেশের সাহিত্য প্রেমিকদের মনে মোটেই দাগ কাটতে পারেনি। তাঁর নৈরাজ্যবাদী ও ইসলাম বিরোধী সাহিত্যকর্ম এদেশে প্রত্যাখ্যাত হলেও ভারতীয় মহলে তাঁর সাহিত্যকর্ম বিশেষ কারণে সাড়া জাগিয়েছিল। পাশ্চাত্য দেশসমূহ কেন যে তার ইসলামবিরোধী বক্তব্য লুফে নিয়েছিল তা বোঝা অত্যন্ত সহজ। তসলিমা নাসরিন এখন ইউরোপের বহুদেশে অত্যন্ত আদরের সাথেই প্রতিপালিত

www.pathagar.com

হচ্ছেন। আমাদের দেশের এক শ্রেণীর চিহ্নিত বুদ্ধিজীবী ভারত ও পাশ্চাত্যের মনোভাবের সুযোগ নিয়ে সম্ভবতঃ আর্থিক সুবিধা ও যশের আশায়, কারণে ও অকারণে ইসলামের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে শুরু করেছেন। এঁরা একশ্রেণীর পরভুক জীব হিসেবেই যেন পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে আগ্রহী। আর ইসলামবিরোধীরাও টাকা-পয়সা খরচ করে ইসলামের বিরুদ্ধে এঁদেরকে ব্যবহার করতে উঠে পড়ে লেগেছে।

ও. আই. সি. ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের রাজনীতি

বিশ্বে বর্তমানে মুসলমানের সংখ্যা কম নয়। জনসংখ্যায় মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এমন রাষ্ট্রের সংখ্যাও বর্তমানে পঞ্চাশের উপর। তাছাড়া বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দেশ চীন, ভারত, ফ্রান্স, গ্রেটবৃটেন, আমেরিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকাতেও মুসলিম জনসংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নয়। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ে 'অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক ফনফারেন্স' নামে একটি প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। বর্তমানে এই ও. আই. সি. র সদস্য সংখ্যা হচ্ছে তিপ্পান্ন। অতিসত্বর আরো কিছু রাষ্ট্র ও. আই. সি. র সদস্য হওয়ার চেষ্টা করছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মুসলিমঅধ্যুষিত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো ছিল অত্যন্ত গরীব। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে তৈলসম্পদ আবিষ্কৃত হওয়ার পর এই মুসলিম রাষ্ট্রগুলো বিশ্বে ধনী দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। সারা বিশ্বে সংগত কারণেই তাদের এখন বেশ কদর। কিছুদিন আগেও এই তৈলসমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলো চাইলে বিশ্বের অর্থনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে পারত। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, এসব রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী এই তৈলসম্পদের উপর তাদের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ এখনো প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। দু'একটি রাষ্ট্র ছাড়া এই রাষ্ট্রগুলো পাশ্চাত্যের, বিশেষ করে আমেরিকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। ফলে তৈলসম্পদের সত্যিকার সুফল ভোগ করছে আমেরিকাসহ পাশ্চাত্যের দেশগুলোই। তৈল বিক্রি করে এতদিন যে অর্থ তারা পেত তাও তারা আমেরিকার ব্যাংকেই জমা রাখত। লক্ষণীয় যে, আমেরিকার ব্যাংকগুলো প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রিত হয় ইহুদীদের দ্বারা। এই ইহুদীরা

www.pathagar.com

হল মুসলমানদের প্রধান শত্রু। সত্যিকারভাবে আমেরিকায় গচ্ছিত আরবদেশগুলোর টাকার সুবিধা ভোগ করছে মুসলমানদের প্রধান শত্রু ইহুদীরাই। আরবদেশগুলো পেত ঐ টাকার কিছু সুদ মাত্র, যদিও তারা তাদের নিজ দেশে সুদকে নিষিদ্ধ বলে থাকে। অথচ তাদের যে বিপুল টাকা ছিল যদি তারা তা অনুন্নত মুসলিম বিশ্বের শিল্পায়নে বিনিয়োগ করত তবে তারা আরো অনেক বেশী অর্থ উপার্জনে সক্ষম হত। সাথে সাথে অনুন্নত মুসলিম বিশ্বও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কিছুটা এগিয়ে যেত। তাদের কাছে অর্থ থাকলেও 'টেকনিক্যাল নো হাউ' বলে তখন কিছু ছিল না। পক্ষান্তরে তখন পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় 'টেকনিক্যাল নো হাউ' এর বিশেষ কোন অভাব ছিল না। কিন্তু তারাও তখন মূলধনের অভাবে এগুতে পারেনি। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো যদি তখন যৌথ বিনিয়োগের মাধ্যমে এসকল দেশের শিল্পায়নে এগিয়ে আসত তবে উভয়েই লাভবান হত। কিন্তু সেই সুযোগ এখন আর নেই। নব্বইয়ের মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের পরে মধ্যপ্রাচ্যের তৈলসমৃদ্ধ এই দেশগুলোর সঞ্চিত অর্থত শেষ হয়েছেই, অধিকন্তু তারা এখন আমেরিকার নিকট ঋণী হয়ে আছে। মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে আমেরিকান খেলের দরুণ এই দেশগুলো আর কোনদিন আমেরিকান বলয় থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমাদের জানামতে এখন তৈলসমৃদ্ধ মাত্র দুটো দেশই আমেরিকান বলয়ের বাইরে আছে। সে দুটি দেশ হচ্ছে ইরান ও লিবিয়া।

মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক গতিধারা সম্পর্কেও এখানে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। এসব দেশে গণতন্ত্রের কোন অস্তিত্বই নেই। রাজা, শেখ অথবা একনায়কের শাসনেই দেশগুলো চলছে। সেখানকার সাধারণ মানুষ (মুসলমান) সর্বপ্রকারের গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। তারা নিজেদের দেশের উন্নতির ব্যাপারে বিশেষ কোন ভূমিকাই রাখে না। ধনী দেশ হওয়ার কারণে তারা অতি সহজেই টাকা কামিয়ে আরাম আয়েসের মধ্যে অলস জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তাদেরকে বিদেশ থেকে আগত লোকের উপরই নির্ভর করতে হয় যার ফলে তাদের দেশে বিদেশ থেকে আগত লোকের সংখ্যাই বেশী। বিদেশ থেকে লোক আনার ব্যাপারে তারা অমুসলমানদেরকেই

www.pathagar.com

প্রাধান্য দিয়ে আসছে। যে সকল ক্ষেত্রে দক্ষ মুসলমান যথেষ্ট পরিমাণেই পাওয়া যায় সেসব ক্ষেত্রেও কেন তারা অমুলসমানদের নিয়ে পবিত্র আরবভূমিকে কলুষিত করার সুযোগ দিচ্ছে তা বোধগম্য নয়। এসব অমুসলমানদের প্রভাবে পবিত্র আরবভূমিতে যে সকল অনৈসলামিক আচার-আচরণ ঢুকছে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া কি কিছু দিনের মধ্যেই তাদের দেশে দেখা দেবে না? গত মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের সময় আমেরিকান-বৃটিশ ও ফরাসী খৃষ্টান সৈনিকদের আগমনের ফলশ্রুতিতে আরব সমাজে কি পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছে তা অনুভব করতে পারবেন যাঁরা মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের পূর্বে আরব ভূমি দেখেছেন এবং যাঁরা এখন আবার দেখতে যাবেন তাঁরাই। আমাদের বিশ্বাস বিদেশী লোক নিয়োগের ব্যাপারে যে সকল ক্ষেত্রে উপযুক্ত মুসলমন পাওয়া যাবে সেই সকল ক্ষেত্রে অমুসলিম নিয়োগ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেয়াই তাদের উচিত।

এখানে আরো একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করতে চাই। আর সেই বিষয়টি হচ্ছে ইসলামী আন্দোলনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির মানসিকতা। লক্ষণীয় যে, মুসলিমপ্রধান আরবদেশগুলোতে বেশ কিছুদিন থেকে খাঁটি ইসলামী আন্দোলনের পথ শাসকগোষ্ঠী রুদ্ধ করে দিয়েছে। মিশরে হাসান-আল-বান্নার নেতৃত্বে ইসলামিক ব্রাদারহুড নামে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তা ছিল বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনগুলোর একটি শক্তিশালী ও সুসংগঠিত আন্দোলন। এই আন্দোলনটিকে মিশরীয় শাসকগোষ্ঠী অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক পন্থায় নৃশংসভাবে দমাবার চেষ্টা করেছে। তাদের বিরুদ্ধে শাসক গোষ্ঠী এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে যে সব অত্যাচার চালিয়েছে তাকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে তারা যদি এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে সন্ত্রাসের আশ্রয় নিতে শুরু করে তবে তাদেরকে দোষ দেয়া যায় কি? ইসলামিক ব্রাদারহুড আন্দোলন মিশরে শাসকগোষ্ঠীর কাছ থেকে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে ঐ আন্দোলন ধীরে ধীরে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য আরবরাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়ে। যদিও এই আন্দোলন বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিতি লাভ করেছে, মূলতঃ এই আন্দোলনগুলোর মধ্যে মৌলিক কোন বিরোধ নেই। অত্যন্ত লক্ষণীয় ব্যাপার হল যে, সকল আরব রাষ্ট্রেই শাসকগোষ্ঠীর কাছ থেকে ইসলামী আন্দোলনগুলো বাধাপ্রাপ্ত হয়ে

www.pathagar.com

আসছে। এর মূল কারণ হচ্ছে এই যে, সত্যিকারের ইসলাম যদি এসকল দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় তবে শাসকগোষ্ঠী ইসলামের নামে এতদিন যেভাবে দেশ শাসন করেছে তার সত্যিকার রূপ জনগণের কাছে ধরা পড়ে যাবে। ইসলামের নামে এতদিন.তারা যে অনৈসলামিক জীবন যাপন করে আসছিল তা থেকেও তারা বঞ্চিত হবে। তাই তারা এই আন্দোলনগুলোকে দমাবার জন্য সর্বপ্রকারের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের আশ্রয় নিচ্ছে। এ আন্দোলনগুলোর মোকাবেলা করার জন্য আরব রাষ্ট্রগুলোর শাসকগোষ্ঠী পরস্পরের সাথে সহযোগিতা করছে। এটা আমাদের জন্য একটা লজ্জাকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় যখন আমরা দেখি ও. আই. সি. পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে ইসলামী হুকুমতপন্থীদেরকে মৌলবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ও. আই. সি'র শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানকারী সদস্যদেরকে আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই, তাঁরা ইসলাম বলতে কি বোঝেন? 'ঈমান' কি ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়? ইসলাম বলতে কি তারা শুধু নামাজ রোজা হজ্জ্ব জাকাতকে বোঝেন? আল্লাহ্ ও রসুলের বিধানকে মেনে নেয়াটা কি ঈমানের অঙ্গ নয়? তাই যদি হয় তবে ইসলামী হুকুমত যাঁরা চান তাঁরা মুসলিম শাসকদের দৃষ্টিতে কি অপরাধ করেছেন? পাশ্চাত্যকে খুশী করে নিজেদের শাসনকে স্থায়ী করার উদ্দেশ্যেই কি তাঁরা এই আন্দোলনগুলোকে 'মৌলবাদী' হিসেবে আখ্যায়িত করছেন? আলজেরিয়ার আই. এস. এফ. এবং মিশরের ইসলামী হুকুমতপন্থীরা তাদের দৃষ্টিতে কেন 'মৌলবাদী' বলে আখ্যায়িত হল? আলজেরিয়ার সামরিক জান্তা আই. এস. এফ. এর নির্বাচনে জেতার কারণে অন্যায়ভাবে নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করে আই.এস. এফ. কে বেআইনী ঘোষণা করল। ও. আই. সি. সেব্যাপারে কোন বক্তব্য দিচ্ছে না কেন? ও. আই. সি. যদি ইসলামী হুকুমতের বিরোধিতা করে তবে ও. আই. সি. গঠনের মূল উদ্দেশ্যেই ব্যর্থ হয়ে যায় নাকি?

মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই প্যালেস্টাইনের কথাও এসে পড়ে। বৃটিশরা তাদের চিরাচরিত রাজনৈতিক কূটকৌশলের ছাপ প্যালেস্টাইনেও রেখে যায়। তারা প্যালেস্টাইন ছেড়ে যাওয়ার পূর্বে প্যালেস্টাইনকে দ্বিধাবিভক্ত করে এক অংশ ইহুদীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে ইসরাইল নামে একটি রাষ্ট্র এবং আরেক অংশ আরবদের হাতে দিয়ে প্যালেস্টাইন নামক আরেকটি রাষ্ট্র

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে। এ পর্যায়ে আরব রাষ্ট্রগুলো বৃটিশের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। বৃটিশরা প্যালেস্টাইন ছেড়ে যাওয়ার পূর্বে ইহুদীরা বৃটিশের কাছ থেকে ইসরাইলের দখল বুঝে নেয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, প্যালেস্টাইন নামক কোন রাষ্ট্রের দখলই আরবরা বুঝে নিল না। ঐ অংশটুকুর কিছু মিশর, কিছু জর্দান এবং কিছু সিরিয়া দখল করে নেয়। বস্তুতঃ প্যালেস্টাইন তিনটি আরব রাষ্ট্রের দখলে থাকায় রাষ্ট্র হিসেবে কোন স্বীকৃতি পেল না। এখানেই আরব জগৎ সবচেয়ে বড় ভুল করল। যে ভুলের কারণে এখনও তাদেরকে বিরাট খেসারত দিতে হচ্ছে।

ষাটের দশকে মিশরের কর্ণেল নাসের উগ্র আরব জাতীয়তাবাদের জন্ম দেন। সারা আরবের একচ্ছত্র নেতা হওয়ার মোহে তিনি রাশিয়ান ব্লকে যোগ দিয়ে ইসরাইলের বিরুদ্ধে ১৯৬৭ সালে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। সেই যুদ্ধে রাশিয়ার যে মনোভাব দেখা গেল তাতে মুসলিম জগতের দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হল যে, মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইলকে টিকিয়ে রেখে আরব জগতে রাশিয়া তার প্রভাব বাড়ানোর এক ফন্দি এঁটেছে। আমেরিকা কিন্তু সেই যুদ্ধে সরাসরি ইসরাইলকে সমর্থন দিয়ে সমস্ত প্যালেস্টাইন, মিশর ও সিরিয়ার কিছু অংশ ইসরাইল কর্তৃক দখলের যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করে। এভাবে আরব ভূখন্ডে কর্ণেল নাসেরের একচ্ছত্র নেতৃত্ব পাওয়ার আশা চিরতরে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। এই যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই কর্ণেল নাসের রাশিয়ানদের সাথে সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন করে দিলেন। কার্যতঃ কর্ণেল নাসেরের মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পরে মিশরীয় পররাষ্ট্র নীতিতে পরিবর্তন সুস্পষ্টভাবে সূচিত হয়। কর্ণেল নাসেরের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের প্ররোচনায় ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির মাধ্যমে ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেন। ফলশ্রুতিতে ইসরাইল দখলকৃত মিশরীয় ভূখন্ড মিশরকে ফিরিয়ে দেয়। এখানে একটি ব্যাপার লক্ষণীয় যে, ১৯৬৭ সালে মিশরীয় প্রেসিডেন্ট কর্ণেল নাসেরের আরব নেতৃত্বের যে উগ্র বাসনা সমস্ত আরব জাহানের মুখে চুনকালি লেপন করেছিল সেই মিশরই আরবদের মধ্যে সকলের আগে ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিল। এর ফলে সারা মুসলিম জাহানে মিশরের তীব্র সমালোচনা হল এবং আরবলীগ থেকে মিশরকে বহিষ্কার করা হল। আনোয়ার সাদাতের এই ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হয়ে এক সামরিক কুচকাওয়াজের সময় মিশরের

www.pathagar.com

এক সাধারণ সৈনিক আনোয়ার সাদাতকে গুলী করে হত্যা করে। তাঁর মৃত্যুর পর জেনারেল হোসনি মোবারক মিশরের প্রেসিডেন্ট হলেন। তিনিও তাঁর পূর্বসুরী আনোয়ার সাদাতের নীতিই অনুসরণ করতে থাকেন। ধীরে ধীরে প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক আরব বিশ্বে, আরব বিশ্বেই বা বলি কেন, সমগ্র মুসলিম জাহানে আমেরিকার এক নম্বর এজেন্ট হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। এখনও তিনি এই এক নম্বরে থেকেই মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার অত্যন্ত বিশ্বস্ত এজেন্ট হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন।

মধ্যপ্রাচ্যে প্যালেস্টাইন সমস্যা হচ্ছে অন্যতম প্রধান সমস্যা। নিজেদের মাতৃভূমির মুক্তির লক্ষ্যে প্যালেস্টাইনী মুক্তি যোদ্ধারা বহু গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে আজ প্রায় ৪৭/৪৮ বৎসর সংগ্রাম করে আসছে। পরবর্তীতে ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সমন্বয়ে পি.এল.ও. নামে একটি সংগঠন জন্ম নেয়। বিশ্ব মুসলিমের নিকট এই প্রতিষ্ঠানটি প্যালেস্টাইনীদের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। একপর্যায়ে ইয়াসির আরাফাত প্যালেস্টাইনীদের মুখপাত্র হিসেবে স্বীকৃতি পান। মিশরের হোসনি মোবারককে আমেরিকানরা নিজেদের বিশ্বস্ত লোক হিসেবে পাওয়ার পর কি করে পি. এল. ও. নেতা ইয়াসির আরাফাতকে হাত করা যায় তার চেষ্টা করে আসছিল। কূটনৈতিক পর্যায়ে সফলতা অর্জন করতে না পেরে পাশ্চাত্য শক্তি প্যালেস্টাইনের এক খৃষ্টান সুন্দরী যুবতীকে ইয়াসির আরাফাতের পেছনে লেলিয়ে দেয়। সেই ফাঁদে ধরা দিয়ে ইয়াসির আরাফাত বৃদ্ধ বয়সে ঐ খৃষ্টান যুবতীকে বিয়ে করেন। এই বিবাহের পর থেকে পি.এল.ও. ধীরে ধীরে তাদের অতীত ভূমিকা থেকে সরে আসতে শুরু করে। বিগত মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের সময় ইরাককে সমর্থন দিয়ে যে ভুল তারা করেছিল পি.এল.ও. এর ভূমিকা পরিবর্তনের পেছনে তারও একটা প্রভাব পড়েছিল। ইয়াসির আরাফাত তাঁর বিয়ের পর থেকে তাঁর স্ত্রীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য শক্তিগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেন। শেষ পর্যন্ত আমেরিকার প্রভাবে পি. এল. ও. ইসরাইলের সাথে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। সেই চুক্তির ফলে ইসরাইল গাজা ও পশ্চিমতীরের জেরিকো শহরে প্যালেস্টাইনীদের স্বায়ত্ত শাসন দিতে রাজী হয়। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, যে পি.এল.ও. একদিন ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিতে রাজী ছিল না সেই পি.এল.ও. এখন ইসরাইলের অধীনে প্যালেস্টাইনের

www.pathagar.com

অতি ক্ষুদ্র একটি অংশের স্বায়ত্তশাসন মেনে নিতে রাজী হল। এসব কিছুই হচ্ছে ইরাকের কুয়েত দখল এবং ইয়াসির আরাফাতের সুন্দরী খৃষ্টান তরুণী বিবাহের ফলশ্রুতি। এসব ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে নিশ্চিতভাবে একথা বলা যায় যে, মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার রাজনৈতিক খেল সফল হয়েছে। পরিস্থিতি এমন এক অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে যে, কিছুদিনের মধ্যে বাকী আরবরাষ্ট্রগুলোও ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিয়ে তার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরুর উদ্যোগ নিচ্ছে। কিন্তু সাধারণ আরব জনগণের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া তীব্রভাবে দেখা দিতে শুরু করেছে। জনগণের মধ্যে সৃষ্ট এই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতিতেই শাসক গোষ্ঠীসমূহের বিরুদ্ধে প্রায় প্রতিটি আরবরাষ্ট্রেই আন্দোলন গড়ে উঠছে। আমার মনে হয় সেদিন আর বেশী দূরে নয় যেদিন আরবভূমি থেকে এই ভণ্ড মুসলিম শাসকদের উৎখাত করে সেখানে মুসলমানেরা ইসলামী হুকুমত কায়েম করবে।

শেষ কথা

আমরা বিশ্বাস করি ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন। এ জীবনদর্শন খোদ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতালার কাছ থেকেই এসেছে যিনি ভূত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী। তাই তাঁর দেয়া এই জীবনদর্শনই হচ্ছে উত্তম জীবনদর্শন যা অনুসরণ করলে পৃথিবী সত্যিকার শান্তি ও সমৃদ্ধিতে ভরপুর হয়ে উঠবে। অতীতে এই জীবনদর্শনকে অনুসরণ করে কোন কোন মানবগোষ্ঠী সত্যিকার শান্তি ও সমৃদ্ধির মুখ দেখলেও বর্তমানে মানবজাতি বিশেষ করে আমাদের সমাজ এই জীবনদর্শন থেকে অনেক দূরে সরে গেছে।

কোন সমাজে সত্যিকার ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রধানতঃ দুটি শর্তের পূরণ হওয়া চাই। প্রথম শর্ত হল, যে মানবগোষ্ঠীতে এআদর্শ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন তার অধিকাংশ লোককেই এ আদর্শ বাস্তবায়নের সমর্থক হতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত হল, এই আদর্শ বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দেয়ার মত চরিত্রবান ও উপযুক্ত নেতার উপস্থিতি। এই দুই শর্ত পূরণ না হলে ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর নয়। আমাদের বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ লোকই এই আদর্শ বাস্তবায়নে আগ্রহী। কিন্তু বর্তমান যুগে এ আদর্শের সঠিক বাস্তবায়নে নেতৃত্বের

www.pathagar.com

অভাব থাকায় এখনও ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র কায়েম হচ্ছে না। যদিও ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে ক্রমেই নেতৃত্ব গড়ে উঠার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে তবুও এদেশে ইসলামবিরোধীদের আন্দোলনের ফলে সমাজের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ অংশ দিনের পর দিন ইসলাম থেকে বহুদূরে সরে যাচ্ছে। আমাদের ভয় হয় এই ইসলামবিরোধী আন্দোলনগুলোর কর্মতৎপরতা এবং রাষ্ট্রের নেতৃত্বে যাঁরা বর্তমানে রয়েছেন তাঁদের অনৈসলামিক কার্যকলাপের ফলে এদেশের জনগোষ্ঠী ধীরে ধীরে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের বিরোধী হয়ে উঠতে পারে। তাই দেশের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এদেশে ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অত্যন্ত জরুরী ভিত্তিতে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন নিতান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

এধরণের পরিকল্পনা প্রণয়ণের পূর্বে বিশেষ কয়েকটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন। এই বিষয়গুলোর মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ইসলামের দৃষ্টিতে ইবাদত সম্পর্কে বিভিন্ন মুসলিম গোষ্ঠীর মধ্যে বিরাজমান মতপার্থক্য। এই মতপার্থক্যের কারণে বিভিন্ন মাযহাব অথবা পরবর্তী পর্যায়ে আরো বিভিন্ন গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। শিয়া এবং সুন্নী, কেয়ামী এবং বেকেয়ামী, নামাজে আমীন মনে মনে পড়া অথবা উচ্চস্বরে পড়া এবং দোয়াল্লীন ও জোয়াল্লীন ধরণের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। ইবাদতের বাহ্যিক রূপ নিয়ে নানা মতপার্থক্য থাকলেও 'কোরানী শাসন' সম্বন্ধে কিন্তু তাদের মধ্যে সত্যিকার কোন মতপার্থক্য নেই। তাই আমরা মনে করি ইবাদতের ব্যাপারে মতপার্থক্য থাকলেও 'কোরানী শাসন' সম্পর্কে মতপার্থক্য না থাকার কারণে রাজনৈতিক মতবাদের দিক দিয়ে তাদের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। এমতাবস্থায় সকলে মিলে একটি রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী হিসেবে গড়ে উঠতেও কোন অঁসুবিধা নেই। রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতেই রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর জন্ম হয়। যেহেতু রাজনৈতিক আদর্শের ব্যাপারে মৌলিক কোন বিরোধ নেই তাই একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী সকলে মিলে একটি রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী তৈরী করতেও আপত্তি থাকার কারণ থাকতে পারে না। ইসলাম আদর্শের ভিত্তিতেই নেতৃত্ব বাছাই সমর্থন করে। নেতৃত্বের কারণে বিভিন্ন দল করা ইসলামী স্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এই ব্যাপারটি ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের বিশেষ

www.pathagar.com

গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন। আমাদের মূল লক্ষ্য হল ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করা। এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য হাসিলের ব্যাপারে আমাদের সবাইকে ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে ইসলামী আন্দোলনের স্বার্থের কথাই চিন্তা করতে হবে। আমাদের নেতৃত্বের কোন্দলে ইসলামী আন্দোলন ব্যাহত হলে আমরা আল্লাহ ও রসুলের কাছে দায়ী থাকব। এমনকি মানবতার বিচারেও আমরা দোষী সাব্যস্ত হব।

যেহেতু ইসলাম একটা পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ তাই এআদর্শে বিশ্বাসী সকল মানুষকেই জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ইসলামের ভূমিকা মেনে চলতে হবে। একজন মুসলমানের আধ্যাত্মিক জীবন,ব্যক্তিগত জীবন, সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবন ইসলামের নির্দেশেই পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। এদেশে এক শ্রেণীর লোক রয়েছেন যাঁরা বলতে চান আধ্যাত্মিক জীবন ও ব্যক্তিগত জীবনেই ধর্ম সীমাবদ্ধ থাকবে। সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মের কোন ভূমিকা থাকবে না। তাঁদের এ ধরণের মতবাদ অন্যান্য ধর্মের ব্যাপারে প্রযোজ্য হতে পারে কিন্তু ইসলামের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়। কেননা ইসলাম একটি সম্পূর্ণ জীবনবিধান। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্যই দিক নির্দেশনা রয়েছে। তাই সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবন একজন মুসলমানের জন্য সম্পূর্ণরূপে ইসলামী ভাবধারার পরিপ্রেক্ষিতে পরিচালিত হওয়া উচিত। ইসলামে বিশ্বাসী একজন মানুষ রাজনীতিবিবর্জিত ইসলামের কথা চিন্তাও করতে পারে না। কোন মুসলমান যদি রাজনীতিবিবর্জিত ইসলামের কথা চিন্তা করেন তবে বলতে হবে তিনি ইসলামের ব্যাখ্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ অথবা জ্ঞানপাপী। একজন সত্যিকার মুসলমান রাজনীতির স্বার্থে ইসলামের আশ্রয় নেয় না, ইসলামের সত্যিকারের প্রয়োজনের স্বার্থেই রাজনীতি তাকে করতে হয়। তাই ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থে আমাদের সকলেরই সম্মিলিতভাবে ইসলামী আন্দোলনের পথে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক কর্মীদেরকে মোটামুটিভাবে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পরে। এদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর রাজনৈতিক কর্মী হচ্ছে তারাই যারা ইসলামী আদর্শ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে এবং সে আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করে। এদেরকে ইসলামী আন্দোলনের কর্মী হিসেবে

www.pathagar.com

আখ্যায়িত করা যায়। আর যারা সত্যিকারভাবে কোন রাজনৈতিক মতবাদের উপরই বিশ্বাস করে না কিন্তু ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল অথচ ইসলাম সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা না থাকার কারণে ইসলামের উপর কোন বক্তব্যও রাখে না তারা রাজনৈতিক মতবাদবিহীন দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক কর্মী। এরা হচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজনৈতিক কর্মী। তৃতীয় শ্রেণীর রাজনৈতিক কর্মী তাদেরকেই বলা যেতে পারে কোন প্রকার রাজনৈতিক মতবাদের উপরই যাদের বিশ্বাস নেই এবং শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যেই ইসলামের পক্ষে কথা বলে। কার্যক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা রূপায়ণের পক্ষে এরা কোন কাজই করে না। এদেরকে মূলতঃ সুবিধাবাদী রাজনৈতিক কর্মী বলা চলে। চতুর্থ শ্রেণীর রাজনৈতিক কর্মী হচ্ছে তারা যারা ইসলামবিরোধী মতবাদে বিশ্বাসী এবং এদেশে যাতে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে না পারে তার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করে। তাদেরকে ইসলামবিরোধী রাজনৈতিক কর্মী বলা চলে। এই শেষোক্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক কর্মীদের আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে রয়েছে ঐ ধরণের রাজনৈতিক কর্মী যারা ইসলামকে তথাকতিথ ধর্ম হিসেবেই চিন্তা করে এবং রাজনীতি থেকে ইসলামকে যথাসাধ্য দূরে রাখার চেষ্টা করে। তারা কোন প্রকার রাজনৈতিক আদর্শেই বিশ্বাস করে না। শুধুমাত্র ধর্মকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে। তারা মনে করে ধর্মকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখার কারণে সকল ধর্মবিশ্বাসী লোকের কাছ থেকে তারা সমর্থন পাবে। এদেরকেও সুবিধাবাদী রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে ধরা যায়। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে ঐ সকল কর্মী যারা ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসের সাথে সাথে বিশেষ একটি রাজনৈতিক মতবাদকে এদেশে প্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করে। এদেরকে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক কর্মী বলা হলেও সুবিধাবাদী রাজনৈতিক কর্মী বলা চলে না। তারা বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী রাজনৈতিক কর্মী হিসেবেই পরিচিত।

এদেশে ইসলামী আন্দোলনের জন্য কোন পরিকল্পনা তৈরী করতে হলে এদেশের সৃষ্টির মূল কারণ, জন্মলগ্নের সঠিক ইতিহাস এবং আমাদের প্রতি বর্তমান জগতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গোষ্ঠীগুলোর অতীত ও বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গীর কথা সামনে রেখেই কাজ করতে হবে। তা না হলে প্রণীত পরিকল্পনা আমাদের অগ্রগতির বাহন না হয়ে ধ্বংসেরই কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাই যে কোন সমাজ

www.pathagar.com

হিতৈষীরই এসব বিষয়ে সঠিক তথ্য জানা থাকা প্রয়োজন। এখানে একটি বিষয় আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, আমাদের দেশে একশ্রেণীর লোক রয়েছে যারা আমাদের ইতিহাস বিকৃত করার কাজ নিরলসভাবে করে যাচ্ছে। ইতিহাসবিকৃতির মাধ্যমে তারা আমাদের যুব সমাজকে আমাদের ঐতিহ্য সম্পর্কে অজ্ঞ রেখে ভিন্ন পথে পরিচালিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। তাই আমাদের সঠিক ইতিহাস যুব সমাজের কাছে তুলে ধরা নিতান্তই প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

আমরা যারা রাজনীতি করি তাদের রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য হল দেশের অস্তিত্ব ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা। দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব যদি রক্ষা করা না যায় তবে আমাদের রাজনীতি করার কোন যৌক্তিকতাই থাকতে পারে না। তাই আমাদের সকল কাজের মূল্যায়ন করতে হবে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের পরিপ্রেক্ষিতে। এই উদ্দেশ্যের সফল বাস্তবায়নের জন্য ক্ষমতায় যাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু যারা ক্ষমতায় গিয়ে সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কোন চেষ্টাই করে না তাদের ক্ষমতায় বসিয়ে জনগণের কি লাভ? কেনই বা জনগণ তাদেরকে ক্ষমতায় যেতে সাহায্য করবে?

আমাদের এই দেশের সৃষ্টি হয়েছে ধর্মের ভিত্তিতে। বাংলাও দু'ভাগ হয়েছে ধর্মের ভিত্তিতেই। পূর্ববাংলা পাকিস্তানের অংশ হয়েছিল যেহেতু এদেশ ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল। আর পশ্চিম বাংলা ভারতের অংশ হয়েছিল সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক হিন্দু ছিল বলেই। ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি এবং পূর্ব বাংলার পাকিস্তানে এবং পশ্চিম বাংলার ভারতভুক্তির একমাত্র কারণও ছিল ধর্ম। অতএব আমাদের এই পৃথক রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের পেছনেও যে ধর্মের ভূমিকাই প্রোজ্জ্বল তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এখানে একটি ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষণীয়, আমাদের দেশের বেশ কিছু চিহ্নিত বুদ্ধিজীবী যাঁরা এদেশের পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের বিরোধী তাঁদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যই হল ধর্ম। তাঁরা আমাদেরকে ভুলিয়ে দিতে চান যে, আমরা মুসলমান। এই অশুভ তৎপরতায় যদি তাঁরা সফলতা লাভ করেন, যদি তাঁরা একবার আমাদেরকে ভুলিয়ে দিতে পারেন যে, আমরা মুসলমান তাহলে আমাদের পৃথক রাষ্ট্রের অস্তিত্বের প্রয়োজন আছে তা ভুলিয়ে দিতেও

www.pathagar.com

দেরী হবে না। আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের শত্রুরা ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে আমাদেরকে ইসলাম ও মুসলমানিত্ব থেকে দূরে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস চালাচ্ছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই যে, ইসলাম একটি ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলমানদের নিজেদের ধর্মকর্ম পালন করে বসবাস করার অধিকার সম্পূর্ণ স্বীকার করে। পক্ষান্তরে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক, দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক যেকোন কাজ থেকে তাদেরকে বিরত রাখার ব্যাপারে একটি ইসলামী রাষ্ট্র সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে কোন প্রকার শৈথিল্যই ইসলাম সহ্য করে না। এপর্যায়ে যখন আমরা দেখি যে, দেশের অস্তিত্ব স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের বিরোধীশক্তিসমূহ নিজেদেরকে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি হিসেবে পরিচয় দেয় তখন শংকিত না হয়ে পারি না। অথচ যাঁরা ধর্মের নামে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য আন্তরিকতার সাথে নিরলস সংগ্রাম করে যাচ্ছেন স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের বিরোধী শক্তিগুলো তাঁদেরকেই স্বাধীনতার বিরোধী শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, তারা আর কতদিন এদেশের মানুষকে বোকা বানিয়ে রাখতে পারবে বলে মনে করে। সেদিন হয়ত আর বেশী দূরে নয় যেদিন এদেশের জাগ্রত মুসলিম জনতা স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের এসব ছদ্মবেশী শত্রুকে উৎখাত করতে সক্ষম হবে।

আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আজ যে কথা বলে, কিছুদিন যেতে না যেতেই তারা তার ঠিক বিপরীত কথা বলতে শুরু করে। তারা কি মনে করে যে, রাজনৈতিক নেতারা যাই বলেন দেশের মানুষ তাকেই সঠিক বলে মেনে নেয়? না কি তাঁরা মনে করে যে, দেশের মানুষের স্মরণশক্তি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী? তারা কি এও মনে করে যে, পূর্বে তারা যা বলেছিলে এদেশের জনগণ তা ভুলে গেছে? সত্যিকার চিত্র হল এই যে, জনগণ তা ভুলে যায় না। বিভিন্ন কারণে হয়ত তাদের সঠিক মতামত তারা কখনো কখনো দিতে পারে না। এ ধরণের রাজনৈতিক দলের সত্যিকার স্বরূপ কিন্তু জনগণের কাছে লুক্কায়িত থাকে না। আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রায়শঃ তাঁদের আচার আচরণে চরম বৈপরীত্যের পরিচয় দিয়ে থাকেন। তাঁরা তাদের নিজস্ব মতামত যাই থাকুক না কেন জনসমর্থন লাভের জন্য যা বলার প্রয়োজন তাই-ই বলে জনগণের সমর্থন

www.pathagar.com

আদায় করে নেন। কিন্তু ক্ষমতায় যাওয়ার পর জনগণকে দেয়া ওয়াদা একেবারেই বিস্মৃত হয়ে যান। তখন তাঁরা নিজেদের মতামত অথবা ক্ষমতায় থাকার সুবিধার জন্য যা প্রয়োজন তার ভিত্তিতেই কাজ করতে থাকেন যার ফলে জনগণ আজ প্রায় সকল দলের উপর থেকেই আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। ফলতঃ ক্ষমতায় গিয়ে কোন দলই বেশীদিন জনসমর্থন টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হচ্ছে না। যতদিন রাজনৈতিক দলগুলো তাদের মৌলিক রাজনৈতিক চরিত্রে ফিরে না আসবে ততদিন এই দুঃসহ অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হলে জনগণের উচিত প্রত্যেক রাজনৈতিক দল ও নেতার অতীত কার্যকলাপ ও ব্যক্তিগত চরিত্র পর্যালোচনা করা। প্রকৃতপক্ষে এদেশের সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সচেতন জাগ্রত জনতার উপরই। দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের কর্তব্য হচ্ছে দেশের সাধারণ মানুষকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলা। দেশের সাধারণ মানুষকে যদি আদর্শিকভাবে সচেতন করে তোলা যায় তবেই এদেশ বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াতে সক্ষম হবে।

বিশ্বের নানা দেশে পাশ্চাত্য শক্তি ও রাশিয়ার সমর্থনে মুসলমানদের প্রতি যেভাবে অন্যায় আচরণ করা হচ্ছে সে সম্বন্ধে আমাদের সজাগ থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। প্যালেস্টাইন, বসনিয়া, কাশ্মীর ও চেচনিয়ায় মুসলমানদের উপর যে অত্যাচার অবিচার চলছে তাতে বিশ্বের মুসলমানদেরকে ক্রমেই আরো অধিকতর সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তবে মুসলমানদের মধ্যে যে সব গাদ্দারের সৃষ্টি হয়েছে তাদের ব্যাপারে প্রথম থেকেই সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। কারণ আল্লাহ্ কাফেরদের চাইতেও মুনাফেকদের থেকে বেশী সতর্ক থাকতে বলেছেন। বস্তুতঃ বর্তমান বিশ্বে কাফেরদের চেয়েও মুনাফেকরাই ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথে অধিকতর বাধার সৃষ্টি করছে। মুসলিম জাহানে যদি একবার ইসলামী সমাজ কায়েমের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যায় তবে সারা বিশ্ব তার নমুনা দেখে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতে বাধ্য। কিন্তু বর্তমানে মুসলিম জাহানে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে মুসলিম নামধারী মুনাফেকরাই। তাই মুসলিম জনগণের উচিত ঐক্যবদ্ধভাবে এসব মুনাফেকদের ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত করার ব্যাপারে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ

www.pathagar.com

করা। যদি আমরা মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ থেকে মুনাফেকদের শাসন খতম করতে পারি তবে অতি অল্প দিনের মধ্যেই সারা বিশ্বে ইসলামের জয়যাত্রা শুরু হবে।

এদেশের জন্য ইসলামী আন্দোলনের যেকোন পরিকল্পনা তৈরী করতে হলে আমাদের অতীত ইতিহাস সামনে রেখে দেশের ও মুসলিম বিশ্বের বর্তমান অবস্থা এবং সাথে সাথে ইসলামবিরোধী শক্তিগুলোর কার্যকলাপ সম্বন্ধে সচেতন থেকে আমাদের কাজ করতে হবে। বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের এই সংকটময় মুহূর্তে ইসলামী চিন্তাবিদ ও আধুনিক বিশ্ব সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল, সামাজিক ও রাষ্ট্রগত জীবনে ইসলামের প্রয়োগের দৃঢ় সমর্থক নেতৃবন্দের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি ইসলামই আমাদের দেশ ও সমাজের জন্য একটি সুখী ও সুন্দর জীবনের রূপরেখা দিতে পারে। আমাদের সকল সমস্যার সমাধান ইসলামের দৃষ্টিতে খুঁজলে আমাদের নতুন কোন সমস্যার সৃষ্টি হবে না। তাই মুসলিম অধ্যুষিত আমাদের এই দেশে ইসলামের ভিত্তিতে একটি সুখী সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার পথে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে আমাদের দেশের ইসলামপন্থী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে অতি সত্বর একটি পরিকল্পনা তৈরী করা প্রয়োজন। আমরা আশা করি, ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সময়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে পরস্পরের সহিত সহযোগিতার মাধ্যমে এখন থেকে কাজ শুরু করবেন। সংকীর্ণ দলীয় মনোবৃত্তি ত্যাগ করে তাঁদেরকে বৃহত্তর ইসলামী আন্দোলনের স্বার্থে সকল প্রকার নেতৃত্বের কোন্দল পরিত্যাগ করে এগিয়ে আসতে হবে। তা না হলে আল্লাহ্ ও রসুলের কাছে তাঁরা দায়ী থাকবেন। বর্তমানে ইসলামী আন্দোলনের দাবীদার সকল রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দের কাছে একটি সক্রিয় সম্মিলিত আন্দোলনই আমরা আশা করি। আল্লাহ্ পাকের কাছে কায়মনোবাক্যে মুনাজাত করি তিনি যেন আমাদের নেতৃবৃন্দকে সৎসাহস নিয়ে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা প্রদান করেন। আমীন!

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

1940

Resolution adopted by the All-India Muslim League at Lahore in its twenty-seventh annual session on 23rd March, 1940, commonly known as the 'Pakistan Resolution' with Quaid-e-Azam in the chair.

While approving and endorsing the action taken by the Council and the Working Committee of the All-India Muslim League, as indicated in their resolutions dated the 27th of August, 17th and 18th of September and 22nd of October, 1939, and 3rd of February, 1940, on the constitutional issue, this session of the All-India Muslim League emphatically reiterates that the scheme of federation embodied in the Government of India Act, 1935, is totally unsuited to, and unworkable in the peculiar conditions of this country and is altogether unacceptable to Muslim India.

It further records its emphatic view that while the declaration dated the 18th of October, 1939, made by the Viceroy on behalf of His Majesty's Government is reassuring in so far as it declares that the policy and plan on which the Government of India Act, 1939, is based will be reconsidered in consultation with the various parties, interests and communities in India, Muslim India will not be satisfied unless the whole constitutional plan is reconsidered 'de novo' and that no revised plan would be acceptable to the Muslims unless it is framed with their approval and consent.

Resolved that it is the considered view of this session of the All-India Muslim League that no constitutional plan would be workable in this country or acceptable to the Muslims unless it is designed on the following basic principles, viz., that geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted, with such territorial readjustments as may be necessary, that the areas in which the Muslims are numerically in a majority as in the North-western

www.pathagar.com

and Eastern zones of India should be grouped to constitute "Independent States" in which the constituent units shall be autonomous and sovereign.

That adequate, effective and mandatory safeguards should be specifically provided in the constitution for minorities in these units and in the regions for the protection of their religious, cultural, economic, political, administrative and other rights and interests in consultation with them, and in other parts of India where the Mussalmans are in a minority adequate, effective and mandatory safeguards shall be specifically provided in the constitution for them and other minorities for the protection of their religious, cultural, economic, political, administrative and other rights and interests in consultation with them.

This session further authorises the Working Committee to frame a scheme of constitution in accordance with these basic principles, providing for the assumption finally by the respective regions of all powers such as defence, external affairs, communications, customs, and such other matters as may be necessary.

Proposed by— The Hon'ble Moulvi A.K. Fazlul Haque, Premier of Bengal.

Seconded by— Choudhari Khaliquzzaman Saheb, M.L.A. (U.P.)

Supported by— Maulana Zafar Ali Khan Saheb, M.L.A. (Central)

" Sardar Aurangzeb Khan Saheb, M.L.A. (N.W.F. Province)

" Haji Sir Abdoola Haroon, M.L.A. (Central).

" K. B. Nawab Ismail Khan Saheb, M.L.C. (Bihar).

" Qazi Mohammad Isa Khan Saheb, President of Baluchistan Provincial Muslim League.

www.pathagar.com

" Abdul Hameed Khan Saheb, M.L.A. (Madras).
" I. I. Chundrigar Saheb, M.L.A. (Bombay).
" Syed Abdur Rauf Shah Saheb, M.L.A. (C.P.).
" Dr. Mohammed Alam, M.L.A. (Punjab)
" Syed Zakir Ali Saheb, (U.P.).
" Begum Sahiba Maulana Mohammad Ali
" Maulana Abdul Hamid Saheb Qadri, (U.P.).

Presidential address delivered by the Quaid-e-Azam at the Lahore Session of the Muslim League at Lahore in March 1940, when the historic "Pakistan Resolution" was adopted as the goal of the Muslims of India.

Ladies and Gentlemen,

We are meeting today in our session after fifteen months. The last session of the All-India Muslim League took place at Patna in December 1938. Since then many developments have taken place. I shall first shortly tell you what the All-India Muslim League had to face after the Patna session of 1938. You remember that one of the tasks, which was imposed on us and which is far from completed yet, was to organise the Muslim League all over India. We have made enormous progress during the last fifteen months in this direction. I am glad to inform you that we have established a Provincial League in every province. The next point is that in every by-election to the Legislative Assemblies we had to fight with powerful opponents. I congratulate the Mussalmans for having shown enormous spirit throughout our trials. There was a single by-election in which our opponents won against Muslim League candidates. In the last election to the U.P. Council, that is the Upper Chamber, the Muslim League's success was cent per cent. I do not want to weary you with details of what we have been able to do in the way to forging in the direction

www.pathagar.com

of organising the Muslim League. But I may tell you that it is going up by leaps and bounds.

Next, you may remember that we appointed a committee of ladies at the Patna session. It is of very great importance to us, because I believe that it is absolutely essential for us to give every opportunity to our women to participate in our struggle of life and work. Women can do a great deal within their homes even under purdah. We appointed this committee with a view to enable them to participate in the work of the League. The objects of this central committee were: (1) to organise provincial and district Muslim League; (2) to enlist a larger number of women to the membership of the Muslim League; (3) to carry on an intensive propaganda amongst Muslim women throughout India in order to create in them a sense of greater political consciousness—if awakened amongst our women, remember, your children will not have much to worry about; (4) to advise and guide them in all such matters as mainly rest on them for the uplift of Muslim society. This central committee, I am glad to say, started its work seriously and earnestly. It has done a great deal of useful work. I have no doubt that when we come to deal with their report of work done we shall really feel grateful to them for all the service that they have rendered to the Muslim League.

We had many difficulties to face from January, 1939, right up to the declaration of war. We had to face the Vidya Mandir in Nagpur. We had to face the Wardha Scheme all over India. We had to face ill-treatment and oppression to Muslims in the Congress-governed provinces.

We had to face the treatment meted out to Muslims in some of the Indian States such as Jaipur and Bhavnagar. We had to face a vital issue that arose in that small state of Rajkot. Rajkot was the acid test made by the Congress which would have affected one-third of India. Thus the Muslim League had all along to face various issues from January 1939 up to the time of the declaration of War. Before the War was declared the

www.pathagar.com

greatest danger to the Muslims of India was the possible inauguration of the federal scheme in the Central Government. We know what machinations were going on. But the Muslim League was stoutly resisting them in every direction. We felt that we could never accept the dangerous scheme of the Central Federal Government embodied in the Government of India Act, 1935. I am sure that we have made no small contribution towards persuading the British Government to abandon the scheme of Central Federal Governemnt. In creating that mind in the British Government the Muslim League, I have no doubt, played no small part. You know that the British people are very obdurate people. They are also very conservative; and although they are very clever, they are slow in understanding. After the War was declared, the Viceroy naturally wanted help from the Muslim League. It was only then that he realised that the Muslim League was a power. For it will be remembered that up to the time of the declaration of War, the Viceroy never thought of me but of Gandhi and Gandhi alone. I have been the leader of an important Party in the Legislature for a considerable time, larger than the one I have the honour to lead at present, the Muslim League Party in the Central Legislature. Yet the Viceroy never thought of me before. Therefore, when I got this invitation from the Viceroy along with Mr. Gandhi, I wondered within myself why I was so suddenly promoted and then I concluded that the answer was the 'All-India Muslim League' whose President I happen to be. I believe that was the worst shock that the Congress High Command received, because it challenged their sole authority to speak on behalf of India. And it is quite clear from the attitude of Mr. Gandhi and the High Command that they have not yet recovered from that shock. My point is that I want you to realise the value, the importance, the significance of organising yourselves. I will not say anything more on the subject.

But a great deal yet remains to be done. I am sure from what I can see and hear that Muslim India is now conscious, is now

www.pathagar.com

awake and the Muslim League has by now grown into such a strong institution that it cannot be destroyed by anybody whoever he may happen to be. Men may come and men may go, but the League wll live for ever.

Now, coming to the period after the declaration of War, our position was that we were between the devil and the deep sea. But I do not think that the devil and the deep sea is going to get away with it. Anyhow our position is this. We stand unequivocally for the freedom of India. But it must be freedom for all India and not freedom of one section or, worse still, of the Congress caucus and slavery of Mussalmans and other minorities.

Situated in India as we are, we naturally have our past experiences, and particularly by experience of the past two and a half years years of provincial constitution in the Congress-government provinces we have learnt many lessons. We are now, therefore, very apprehensive and can trust nobody. I think it is a wise rule for everyone not to trust anybody too much. Sometimes we are led to trust people but when we find in actual experience that our trust has been betrayed, surely that ought to be sufficient lesson for any man not to continue his trust in those who have betrayed him. Ladies and gentlemen, we never thought that the Congress High Command would have acted in the manner in which they actually did in the Congress-governed provinces. I never dreamt that they would ever come down so low as that. I never could believe that there would be a gentlemen's agreement between the Congress and the Britishers to such an extent that although we cried hoarse, weak in and out, the Governors were supine and the Governor-General was helpless. We reminded them of their special responsibilities to us and to other minorities and the solemn pledges they had given to us. But all that had become a dead letter. Fortunately, Providence came to our help and the gentlemen's agreement was broken to pieces and the Congress, thank Heaven, went out of office.

www.pathagar.com

I think they are regretting their resignations very much. The bluff was called. So far so good. I, therefore, appeal to you, in all seriousness that I can command, to organise yourselves in such a way that you may depend upon none except your own inherent strength. That is your only safeguard and the best safeguard. Depend upon yourselves. That does not mean that we should have ill-will or malice towards others. In order to safeguard your rights and interests you must create that strength in yourselves that you may be able to defend yourselves. That is all that I want to urge.

Now, what is our positon with regard to future constitution? It is that, as soon as circumstances permit or immediately after the War at the latest, the whole problem of India's future constitution must be examined 'de novo' and the Act of 1935 must go once for all. We do not believe in asking the British Government to make declarations. These declarations are really of no use. You cannot possibly succeed in getting the British Government out of this land by asking them to make declarations. However the Congress asked the Viceroy to make a declarati on. The Viceroy said, "I have made the declaration". The Congress said, "No, no; we want another kind of declaration. You must declare and at once that India is free and independent with the right to frame its own constitution by a Constituent Assembly to be elected on the basis of adult franchise or as soon a franchise as possible. This assembly will, of course, satisfy the minorities legitimate interests". Mr. Gandhi says that if the minorities are not satisfied then he is willing that some tribunal of the highest character and most impartial should decide the dispute. Now, apart from the fact that it is historically and constitutionally absurd to ask the ruling power to abdicate in favour of a Constituent Assembly-apart from all that, suppose we do not agree as to the franchise according to which the Central Assembly is to be elected, or suppose we the solid body of Muslim representatives do not agree with the non-Muslim majority in the Constituent Assembly, what will happen? It is

www.pathagar.com

said that we have no right to disagree with regard to anything that this Assembly may do in framing a national constitution of this huge subcontinent except those matters which may be germane to the safeguards for the minorities. So we are given the privilege to disagree only with regard to what may be called strictly safeguards of the rights and interests of minorities. We are also given the privilege to send our own representatives by separate electorates. Now, this proposal is based on the assumption that as soon as this contribution comes into operation the British hand will disappear. In other words, this proposal comes to this: First give me the declaration that we are a free and independent nation, then I will decide what I should give you back! Does Mr. Gandhi really want the complete independence of India when he talks like this? But whether the British disappear or not, it follows that extensive powers must be transferred to the people. In the event of there being a disagreement between the majority of the Constituent Assembly and the Mussalmans, in the first instance, who will appoint the tribunal? And suppose an agreed tribunal is possible and the award is made and the decision given, who will, may I know, be there to see that this award is implemented or carried out in accordance with the terms of that award? And who will see that it is honoured in practice, because, we are told, the British will have parted with their power mainly or completely? Then what will be the sanction behind the award which will enforce it? We come back to the same answer: the Hindu majority would do it— and will it be with the help of the British bayonet or Mr. Gandhi's "ahinsa"? Can we trust them any more? Besides, ladies and gentlemen, can you imagine that a question of this character, of social contract upon which the future constitution of India would be based affecting 90 million of Mussalmans, can be decided by means of a judicial tribunal? Still that is the proposal of the Congress.

Before I deal with what Mr. Gandhi said a few days ago I shall deal with the pronouncements of some of the other Congress

www.pathagar.com

leaders— each one speaking with a different voice. Mr. Raja Gopal Acharya, the ex-Prime Minister of Madras, says that the only panacea for Hindu-Muslim unity is the joint electorates. This is his prescription as one of the great doctors of the Congress organisation (Laughter). Babu Rajendra Prasad on the other hand only a few days ago said, "Oh, what more do the Mussalmans want?" I will read to you his words. He says, referring to the minority question: "If Britain would concede our right of self-determination surely all these differences would disappear". How will our differences disappear? He does not explain or enlighten us about it.

But so long as Britain held power, the differences would continue to exist. The Congress has made it clear that the future constitution will be framed not by the Congress alone but by the representatives of all political parties and religious groups. The Congress has gone further and declared that the minorities can have their representatives elected for this purpose by separate electorates though the Congress regards separate electorates as an evil. It will be representatives of all the peoples of this country, irrespective of their religious and political affiliations, who will be deciding the future constitution of India and not this or that party. What better guarantee can the minorities have? So, accroding to Babu Rajendra Prasad, the moment we enter the Assembly we shall shed all our political affiliations, religious and everything else. This is what Babu Rajendra Prasad said as late as 18th March, 1940. And this is now what Mr. Gandhi said on the 20th of March, 1940, He says:

"To me Hindus, Muslims, Parsis, Harijans, are all alike, I cannot be frivolous"—but I think he is frivolous—"I cannot be frivolous while I talk of Quaid-e-Azam Jinnah. He is my brother."

The only difference is this, that brother Gandhi has three votes and I have only one vote! (Laughter).

"I would be happy indeed if he could keep me in his pocket".

www.pathagar.com

I do not know really what to say to this latest offer of his.

"There was a time when I could say that there was no Muslim whose confidence I did not enjoy. It is my misfortune that it is not so today."

Why has he lost the confidence of the Muslims today? May I ask, ladies and gentlemen?

"I do not read all that appears in the Urdu press, but perhaps I get a lot of abuse there. I am not sorry for it. I still believe that without a Hindu-Muslim settlement there can be no Swaraj."

Mr. Gandhi has been saying this now for the last 20 years.

"You will perhaps ask in that case why do I talk of a fight? I do so because it is to be a fight for a Constituent Assembly."

He is fighting the British. But may I point out to Mr. Gandhi and the Congress that you are fighting for a Constituent Assembly which, the Muslims say, we cannot accept, which the Muslims say, means three to one, about which the Mussalmans say that they will never be able, in that way, by the counting of heads, to come to any agreement which will be real agreement from the hearts, which will enable us to work as friends and therefore, this idea of a Constituent Assembly is objectionable, apart from other objections.

But he is fighting for the Constituent Assembly, not fighting the Mussalmans at all.

He says, "I do so because it is to be a fight for a Constituent Assembly. If Muslims who come to the Constituent Assembly"—mark the words, "who come to the Constituent Assembly through Muslim votes"—he is first facing us to come to that Assembly—and then says, "declare that there is nothing common between Hindus and Muslims then alone I would give up all hope, but even then I would agree with them because they read the Koran and I have also studied something of that Holy Book". (Laughter)

So he wants the Constituent Assembly for the purpose of

www.pathagar.com

ascertaining the views of the Mussalmans and if they do not agree then he will give up all hope, but even then he will agree with us! (Laughter). Well, I ask you, ladies and gentlemen, is this the way to show any real, genuine desire, if there existed any, to come to a settlement with the Mussalmans? (Voices of no, no). Why does not Mr. Gandhi agree, and I have suggested to him more than once and I repeat it again from this platform, why does not Mr. Gandhi honestly now acknowledge that the Congress is a Hindu Congress, that he does not represent anybody except the solid body of Hindu people? Why should not Mr. Gandhi be proud to say, "I am a Hindu. Congress has solid Hindu backing?" I am not ashamed of saying that I am a Mussalman. (Hear, hear and applause.) I am right and I hope and believe even a blind man must have been convinced by now that the Muslim League has solid backing of the Mussalmans of India. (Hear, hear.) Why then all this camouflage? Why all these machinations? Why all these methods to coerce the British to overthrow the Mussalmans? Why this declaration of non-co-operation? Why this threat of civil disobedience? And why fight for a Constituent Assembly for the sake of ascertaining whether the Mussalmans agree or they do not agree? (Hear, hear). Why not come as a Hindu leader proudly representing your people and let me meet you proudly representing the Mussalmans? (Hear, hear and applause). This is all that I have to say so far as the Congress is concerned.

So far as the British Government is concerned, our negotiations are not concluded yet, as you know. We had asked for assurances on several points, at any rate we have made some advance with regard to one point and that is this. You remember our demand was that the entire problem of the future constitution of India should be examined 'de novo', apart from the Government of India Act of 1935. To that the Viceroy's reply, with the authority of His Majesty's Government, was—I had better quote that—I will not put it in my own words. This is the reply that was sent to us on 23rd December.

www.pathagar.com

"My answer to your question is that the declaration I made with the approval of His Majesty's Government on October the 13th last does not exclude—mark the words 'does not exclude'—examination of any part either of the Act of 1935 or of the policy and plans on which it is based". (Hear, hear).

As regards other matters, we are still negotiating and the most important points are: (1) that no declaration should be made by His Majesty's Government with regard to the future constitution of India without our approval and consent, (Hear hear and applause) and that no settlement of any question should be made with any party behind our back (hear, hear) unless our approval and consent is given to it. We and we alone wish to be the final arbitrator. Surely that is a just demand. We do not want that the British Government should thrust upon the Mussalmans a constitution which they do not approve of and to which they do not agree. Therefore the British Government will be well-advised to give that assurance and give the Mussalmans complete peace and confidence in this matter and win their friendship. But whether they do that or not, after all, as I told you before, we must depend on our own inherent strength and I make it plain from this platform, that if any declaration is made, if any interim settlement is made without our approval and without our consent, the Mussalmans of India will resist (Hear, hear and applause). And no mistake should be made on that score.

Then the next point was with regard to Palestine. We are told that "endeavours, earnest endeavours, are being made to meet the reasonable national demands of the Arabs". Well, we cannot be satisfied by earnest endeavours, sincers endeavours, best endeavours (Laughter). We want that the British Government should in fact and actually meet the demands of the Arabs in Palestine (hear, hear).

Then the next point was with regard to the sending of the troops outside. Here there is some misunderstanding. But anyhow we have made our position clear that we never in

www.pathagar.com

anyway intended and in fact, language does not justify if there is any misapprehension, or apprehension, that the Indian troops should not be used to the fullest in the defence of our own country. What we wanted of the British Government was to give us assurance that Indian troops should not be sent against any Muslim country or any Muslim Power (Hear, hear). Let us hope that we may yet be able to get the British Government to clarify the position further.

This, then, is the position with regard to the British Government. The last meeting of the Working Committee had asked the Viceroy to reconsider his letter of the 23rd of December having regard to what has been explained to him in pursuance of the resolution of the working comrnittee dated the 3rd February and we are informed that the matter is receiving his careful consideration.

Ladies and gentlemen, that is where we stand after the War and up to the 3rd of February.

As far as our internal position is concerned, we have also been examining it and, you know, there are several schemes which have been sent by various well informed constitutionalists and others who take interest in the problem of India's future constitution, and we have also appointed a sub-committee to examine the details of the schemes that have come in so far. But one thing is quite clear. It has always been taken for granted mistakenly that the Mussalmans are a minority and of course we have got used to it for such a long time that these settled notions sometimes are very difficult to remove. The Mussalmans are not a minority. The Mussalmans are a nation by any definition. The British and particularly the Congress proceed on the basis, "Well, you are in minority after all, what do you want?" What else do the minorities want?" Just as Babu Rajendra Prasad said. But surely the Mussalmans are not a minority. We find that even according to the British map of India, we occupy large parts of this country where the Mussalmans are in a majority—such as Bengal, Punjab, N-

www.pathagar.com

W.F.P., Sind and Baluchistan.

Now the question is, what is the best solution of this problem between the Hindus and the Mussalmans? We have been considering, and as I have already said, a committee has been appointed to consider the various proposals. But whatever the final scheme of constitution, I will present to you my views and I will just read to you in confirmation of what I am going to put before you, a letter from Lala Lajpat Rai to Mr. C. R. Das. It was written, I believe, about 14 or 15 years ago and that letter has been produced in a book by one Indra Prakash recently published and that is how this letter has come to light. This is what Lala Lajpat Rai, a very astute politician and a staunch Hindu Mahasabhite said. But before I read this letter it is plain from that that you cannot get away from being a Hindu if you are Hindu! (Laughter). The word 'nationalist' has now becom the play of conjurers in politics. This is what he says:

"There is one point more which has been troubling me very much of late and one which I want you to think carefully and that is the question of Hindu-Mohammedan unity. I have devoted most of my time during the last six months to the study of Muslim history and Muslim law and I am inclined to think it is neither possible nor practicable. Assuming and admitting the sincerity of Mohammedan leaders in the non-co-operation movemnets, I think their religion provides an effective bar to anything of the kind.

"You remember the conversation I reported to you in Calcutta which I had with Hakim Ajmal Khan and Dr. Kitchlu. There is no finer Mohammedan in Hindustan than Hakim Ajmal Khan, but can any Muslim leader override the Koran? I can only hope that my reading of the Islamic law is incorrect".

I think his reading is quite correct (Laughter)

"And nothing would relieve me more than to be convinced that it is so but if it is right then it comes to this although we

www.pathagar.com

can unite against the British we cannot do so to rule Hindustan on British lines. We cannot do so to rule Hindustan on democratic lines".

Ladies and gentlemen, when Lala Lajpat Rai said that we cannot rule this country on democratic lines it was all right but when I had the temerity to speak the same truth about 18 months ago there was a shower of attacks and criticism. But Lala Lajpat Rai said 15 years ago that we cannot do so, viz., to rule Hindustan on democratic lines. What is the remedy? The remedy according to Congress is to keep us in the minority and under the majority rule. Lala Lajpat Rai proceeds further.

"What is then the remedy? I am not afraid of the seven crores of Mussalmans. But I think the seven crores in Hindustan plus the armed hosts of Afghanistan, Central Asia, Arabia, Mesopotamia and Turkey, will be irresistible." (Laughter)

" I do honestly and sincerely believe in the necessity or desirability of Hindu-Muslim unity. I am also fully prepared to trust the Muslim leaders. But what about the injunctions of the Koran nad Hadis? The leaders cannot override them. Are we then doomed? I hope your learned mind and wise head will find some way out of this difficulty"

Now, ladies and gentlemen, that is merely a letter written by one great Hindu leader to another great Hindu leader fifteen years ago. Now, I should like to put before you my views on the subject as it strikes me taking everthing into consideration at the present moment. The British Government and Parliament, and more so the British nation, have been for many decades past brought up and nurtured with settled notions about India's future, based on developments in their own country which has built up the British constitution functioning now through the Houses of Parliament and the system of cabinet. Their concept of party government functioning on political planes has become the ideal with them as the best form of government for every country, and the one-sided and

www.pathagar.com

powerful propaganda, which naturally appeals to the British, has led them into a serious blunder, in producing the constitution envisaged in the Government of Indis Act of 1935. We find that the most leading statesmen of Great Britain, saturated with these notions, have in the pronouncements seriously asserted and expressed a hope that the passage of time will harmonise the inconistent elements in India.

A leading journal like the 'London Tiems' commenting on the Government of India Act of 1935, wrote: 'Undoubtedly the differences between the Hindus and Muslims are not of religion in the strict sense of the word but also of law and culture, that they may be said, indeed, to represent two entirely distinct and separate civilizations. However, in the course of time, the superstition will die out and India will be moulded into a single nation'. So, according to the 'London Times', the only difficulties are superstitions. These fundamental and deep-rooted differences, spiritual, economic, social and political, have been euphemised as mere `superstition', But surely it is a flagrant disregard of the past history of the subcontinent of India as well as the fundamental Islamic conception of society vis-a-vis that of Hinduism to characterise them as mere 'superstition'. Nothwithstanding a thousand years of close contact, nationalities, which are as divergent today as ever, cannot at any time be expected to transform themselves into one nation merely by means of subjecting them to a democratic constitution and holding them forcibly together by unnatural and artificial methods of British Parliamentary Statute.

What the unitary Government of India for 150 years had failed to achieve cannot be realised by the imposition of the central federal Government. It is inconceivable that the fiat or the writ of a Government so constituted can ever command a willing and loyal obedience throughout the subcontinent by various nationalities except by means of armed force behind it.

www.pathagar.com

The problem in India is not of an inter-communal character but manifestly of an international one, and it must be treated as such. So long as this basic and fundamental truth is not realised, any constitution that may be built will result in disaster and will prove destructive and harmful not only to the Mussalmans but to the British and Hindus also. If the British Government are really in earnest and sincere to secure peace and happiness of the people of this subcontinent, the only course open to us all is to allow the major nations separate homelands by dividing India into 'autonomous national states'. There is no reason why these states should be antagonistic to each other. On the other hand, the rivalry and the natural desire and efforts on the part of one to dominate the social order and establish political supremacy over the other in the government of the country will disappear. It will lead more towards natural goodwill by international pacts between them, and they can live in complete harmony with their neighbours. This will lead further to a friendly settlement all the more easily with agreements between Muslim India and Hindu, which will far more adequately and effectively safeguard the rights and interests of Muslims and various other minorities.

It is extremely difficult to appreciate why our Hindu friends fail to understand the real nature of Islam and Hinduism. They are not religious in the strict sense of the word, but are, in fact, different and distinct social orders, and it is a dream that the Hindus and Muslims can ever evolve a common nationality, and this misconception of one Indian nation has gone far beyond the limits and is the cause of most of your troubles and will lead India to destruction if we fail to revise our notions in time. The Hindus and Muslims belong to two different religious philosophies, social customs, literatures. They neither intermarry nor interdine together and, indeed, they belong to two different civilizations which are based mainly on conflicting ideas and conceptions.Their aspects on life and of life are different. It is quite clear that Hindus and Mussalmans derive

www.pathagar.com

their inspiration from different sources of history. They have different epics, different heroes, and different episodes. Very often the hero of one is a foe of the other and, likewise, their victories and defeats overlap. To yoke together two such nations under a single state, one as a numerical minority and the other as a majority, must lead to growing discontent and final destruction of any fabric that may be so built for the government of such a state.

History has presented to us many examples, such as the Union of Great Britain and Ireland, Czechoslovakia and Poland. History has also shown to us many geographical tracts, much smaller than the sub-continent of India, which otherwise might have been called one country, but which have been divded into as many states as there are nations inhabiting them. Balkan Peninsula comprises as many as 7 or 8 sovereign states. Likewise, the Portugese and the Spanish stand divided in the Iberian Peninsula. Whereas under the plea of unity of India and one nation, which does not exist,it is sought to pursue here the line of one central government when we know that the history of the last 12 hundred years has failed to achieve unity and has witnessed, during the ages, India always divided into Hindu India and Muslim India. The present artificial unity of India, which is implicit in the recent declaration of His Majesty's Government, will be the herald of the entire break-up with worse disaster than has ever taken place during the last one thousand years under Muslims. Surely that is not the legacy which Britain would bequeath to India after 150 years of her rule, nor would Hindu and Muslim India risk such a sure catastrophe.

Muslim India cannot accept any constitution which must necessarily result in a Hindu majority government. Hindus and Muslims brought together under a democratic system forced upon the minorities can only mean Hindu raj. Democracy of the kind with which the Congress High Command is enamoured would mean the complete destruction of what is

www.pathagar.com

most precious in Islam. We have had ample experience of two and a half years and any repetition of such a government must lead to civil war and raising of private armies as recommended by Mr. Gandhi to Hindus of Sukkur when he said that they must defend themselves violently or nonviolently blow for blow, and if they could not, they must emigrate.

Mussalmans are not a minority as it is commonly known and understood. One has only got to look round. Even today, according to the British map of India, 4 out of 11 provinces, where the Muslims dominate more or less, are functioning notwithstanding the decision of the Hindu Congress High Command to non-co-operate and prepare for civil disobedience. Mussalmans are a nation according to any definition of a nation, and they must have their homelands, their territory and their state. We wish to live in peace and harmony with our neighbours as a free and independent people. We wish our people to develop to the fullest our spiritual, economic, social and political life in a way what we think best and in consonance with our own ideal and according to the genius of our people. Honest demands and the vital interest of millions of our people impose a sacred duty upon us to find an honurable and peaceful solution, which would be just and fair to all. But at the same time we cannot be moved or diverted from our purpose and objective by threats or intimidations. We must be prepared to face all difficulties and consequences, make all the sacrifices that may be required of us to achieve the goal we have set in front of us.

Ladies and gentlemen, that is the task before us. I fear I have gone beyond my time limit. There are many things that I should like to tell you, but I have already publishced a little pamphlet containing most of the things that I have been saying and I think you can easily get that publication both in English and in Urdu from the League office. It might give you a clear idea of our aims. It contains very important resolutions of the Muslim League and various other statements. Anyhow,

www.pathagar.com

I have placed before you the task that lies on us. Do you realise how big and stupendous it is? Do you realise that you cannot get freedom or independence by mere arguments? I should appeal to the intelligentsia. The intelligentsia in all countries in the world have been the pioneers of any movements for freedom. What does the Muslim intelligentsia propose to do? I may tell you that unless you get this into your blood, unless you are prepared to take off your coats and are willing to sacrifice all that you can and work selflessly, earnestly and sincerely for your people, you will never realise your aim. Friends, I therefore want you to make up your mind definitely and then think of devices and organise your people, strengthen your organisation and consolidate the Muslims all over India. I think that the masses are wide-awake. They only want your guidance and your lead. Come forward as servants of Islam, organise the people economically, socially, educationally and politically and I am sure that you will be a power that will be accepted by everybody (cheers).

1940

A brief summary of speeches delivered on 22nd, 23rd and 24th March, 1940, at Lahore, on the Pakistan Resolution, as published in a pamphlet issued by Nawabzada Liaquat Ali Khan, as Honorary Secretary of the All-India Muslim League:

(1) The Hon. Moulvi Fazlul Haque, the Premier of Bengal, while moving the resolution said that they had stated definitely and in unequivocal terms that what they wanted was not merely tinkering with the idea of federation, but its thorough overhaul so that federation might ultimately go. The idea of federation must not only be postponed, but abandoned.

On many an occasion on the platform of the Muslim League and the other day in the Bengal Legislative Assembly, he had made an emphatic and definite assertion that the Muslims of

www.pathagar.com

India would not consent to any scheme which was framed without their approval. To them only that constitution would be acceptable as was framed from the Muslim point of view.

If any constitution was forced on them, they would make such a constitution absolutely unworkable. He hoped that those who had in their power to shape the future constitition of India would take the Muslim feelings into consideration and would not take any step which might be regretted.

The Muslims, he said, had made their position absolutely clear. At present they constituted 80 millions scattered all over India. It might sound a big number, but as a matter of fact the Muslims were in a weak position numerically in almost every province of India.

In the Punjab and Bengal they were in a majority, but not in an effective majority, and were hopelessly in minority elsewhere.

The postion was such that whatever might be the constitution Muslim interests were bound to suffer just as they had suffered during the last three years of the working of provincial autonomy.

Continuing, Moulvi Fazlul Haque referred to the Presidential Address of Maulana Abul Kalam Azad at the All-India Congress session and characterised as un-Islamic the statement of the Maulana that the Muslims should not feel nervous; eighty millions was not a small number and they need not be afraid.

He reminded the Maulana that even in the Punjab and Bengal the postition of Muslims was not safe. Situated as they were, their political enemies could take advantage of the situation. They had to seek the help of other interests and minorities to form coalition governments which were the weakest form of Government known to constitutionalists.

As regards other provinces, they were in a very weak position and were at the mercy of the majority.

www.pathagar.com

Until a satisfactory solution was found of this unequal distribution of the Muslim population it was useless to talk of constitutional advance or of safeguards, as they were illusory.

He appealed to the Muslims throughout India to remain united and remember that they had to stand on their own feet and could not look to any one for help or even guidance.

(2) Choudhari Khaliquzzaman Saheb, M. L.A. Leader of the Opposition Party in the U.P. Legislative Assembly, seconded the resolution and said that they should consider the circumstance which had forced the Muslims to demand separation.

Firstly, the responsibility for this demand rested on the British Government, "who in order to exploit the Indians decleared that India was one nation and started the majority and minoriy question. They opened a flood of such stupendous propaganda that the question came to be regarded as a real problem where in fact it did not exist".

Secondly, the Congress and the majority community were responsible for the separation demand. The working of the provincial autonomy in the Congress provinces had finally decided the question. The treatment the minorities received required no comment.

The Muslims had now realised that their existence was in danger and, if they wanted to maintain their identity, they must struggle for it.

Thirdly, the demand for separation was a result of the activities of those Muslims who tried to split the ranks of the Muslims by setting up rival organisations or joining the Congress or other non-Muslim political parties.

Maulana Azad, he continued, had said that Muslims should not demand separation because they were strong enough to defend themselves. But, remarked Choudhari Saheb, if the issue between the Hindus and Muslims was to be decided by means of the sword, the Muslims had no fear. They did not

www.pathagar.com

need 9 crores to settle it. As it was, the issue depended on votes.

Continuing, Choudhari Saheb said that a true Muslim Leaguer was the friend of the Congress because he informed them of the true Muslim sentiments. If the Congress continued to act on the advice of Muslim Congressmen, he was sure there would be civil war in India.

He said that Muslims in the minority provinces should not be afraid as to what would happen to them after the partition of India into "Hindu India" and "Muslim India". The same thing would happen to them as to the minorities in the Punjab and Bengal.

Further, he said when the Congress demanded independence from the British, the door was always open, but when they were asking for independence, the door was supposed to be banged. They had been accused of always acting on a negative policy any had never presented constructive proposals and he hoped that they would be considered favourably.

(3) Maulana Zafar Ali Khan Saheb, M.L.A. (Central), supporting the resolution, said that the Congress had achieved the high position it occupied due to the support of the Muslims, but now the Congress had adopted an indifferent attitude towards the Muslims. The Congress or the Hindus had risen to the position by the ladder provided by Muslims and now they had kicked the ladder away.

He then reiterated his own proposal of a Constituent Assembly, consisting of 650 representatives—360 Muslims, 300 Hindus and 50 minorities—for deciding a constitution for India.

(4) Khan Aurangzeb Khan Saheb, M.L.A., leader of the Muslim League Party in N.W.F.P. Legislative Assembly congratulated Muslims living in "Hindu"provinces for lending their support to the resolution which sought freedom for six crore Muslims. He assured the Muslims in minority provinces that they would

www.pathagar.com

lay down their lives to saferguard them.

He added that the British system of democracy, based on counting of heads, was unacceptable. They wanted a home for the Muslim nation.

(5) Haji Sir Abdoola Haroon, M.L.A. (Central), supported the resolution and assured the Muslims in the minority provinces that, if they were oppessed, it would be the duty of the Muslims "to do for them what the Germans did for Sudetenland".

(6) Khan Bahadur Nawab Ismail Khan Saheb, M.L.C. (Behar), rose to support the resolution and expressed that the Muslims in the provinces where they were in minoity had agreed to support the resolution before them. They fully realised the implications of the resolution and they had given their support with the fullest sense of responsibility. Concluding he said that they would employ all constitutional means to achieve the rights of Muslims but if those methods failed they knew very well what to do next.

(7) Qazi Mohammad Isa. President of the Baluchistan Provincial Muslim League, supported the resolution. While thanking the Muslims of the minority provinces for the generous manner in which they had supported the resolution he assured complete and full support to Muslims in the minority provinces. He declared amidst cheers that the Hindus in the Muslim majority provinces would be given a similar treatment which they in their majority provinces would accord to the Mussalmans.

(8) Abdul Hameed Khan Saheb, M.L.A., Leader of the Muslim League Party in the Madras Legislative Assembly, said that the Muslim League was at present busy preparing to achieve independence for all. The Muslims who had never been slaves anywhere excepting in India during the last 150 years could not tolerate perpetual subjection to a Hindu majority. To remain in subjection was against their religion.

www.pathagar.com

(9) Mr. I. I. Chundrigar, M.L.A., Deputy Leader of the Muslim League Party in the Bombay Legislative Assembly, supporting the resolution characterised Congress opposition to Federation as false and unreal. Congress really wanted a Federation under which they could foist their rule on the Muslims and "Kill" their culture and civilization. The scheme of division into regional zones was the only practical scheme and solution of the problem.

Muslim independent States, he added, would have a salutary effect on the Hindu majority provinces.

(10) Syed Abdur Rauf Shah Saheb, M.L.A., leaderof the Muslim League Party in the C.P. and Berar Legislative Assembly referred to what he called "Oppression and atrocities" being committed in his province. Yet in spite of all that had happened, they had remained undaunted. He asked the Muslims in the majority porvinces not to bother about those in the minority provinces because they had faith in their God and he knew that by His grace they would be able to defend themselves and their rights without depending on any support from outside.

(11) Dr. Mohammad Alam, M.L.A., Punjab, who was once a member of the Congress Working Committee and a member of the Punjab Congress Assembly Party till only 20 days back, appeared on the platform amidst cheers and shouts of Allah-ho-Akbar.

Dr. Mohammad Alam who denied the charge of being a "turn-coat" said that if Muslims, from the late Maulana Mohammad Ali right down to a humbler person like him, had to take up the attitude which they did it was the sheer result of their realisation that Congress had given up its ideal. "I have left the Congress, because it has left the right path and renounced its ideal. I have come to realise that the Congress independence means establishment of Hindu raj under British patronage. I am not now with the Congress because it was not its name of which I or others were enamoured. I, like others, was enam-

www.pathagar.com

oured of independence—independence for all alike and that is for what the Congress does not stand now.

Dr. Alam declared that he had now accepted Mr. M. A. Jinnah as his Sardar.

He paid tribute to his new leader whom he had known for a long time. Some newspapers had described Mr. M. A. Jinnah as a "political fanatic". Dr. Alam wished that they had two such fanatics. One to fight the Hindus and the other to fight the British. Dr. Alam said that before joining the League he asked Mr. Jinnah, what he, who had never believed in direct action, would do for the fulfilment of his programme and for the achievement of his ideal. Mr. Jinnah told Dr. Alam "If necessity arose I will give my life" When Dr. Alam enquired if he (Mr. Jinnah) would go to jail the reply given to Dr. Alam was "Before you and you will follow me". This made Dr. Alam, who had understood the League programme, to accept Mr. Jinnah as his leader.

Dr. Alam ridiculed the " blank cheque" presented by Mr. Gandhi because he said that cheque whatever its worth did not contain the name of the person to whom it was to be paid nor did it carry the signature of the person from whose account it could be drawn. He appealed to the Muslims to strengthen the League.

Referring to the resolution Dr. Alam said it meant "declaration of war against the British and against the Hindus". He, however, added that it was also a "message of peace to both". It was a declaration of war, said Dr. Alam because they wanted to impress upon the British their determination to be free even if the Hindus lagged behind. It meant a declaration of war against the Hindus because they wanted to declare they were not going to remain under anyone and from now on they (Muslims) were a nation with one civilization and one culture. Muslims now stood under one flag and if the British or the Hindus wanted to settle with the Muslims they should recognise the power of the League and accept it as the sole

www.pathagar.com

representative body of the Muslims.

He wanted to tell the Muslims in the minority provinces that from New Delhi to Iran it would be one independent Muslim kingdom and they need not fear anyone. He assured the Hindus also of fair treatment everywhere. Dr. Alam continuing his speech said that Mr. Mohammad Ali jinnah had today taught them the last letter of the alphabet of which the a.b.c. was taught by Maulana Mohammad Ali.

Concluding, he said, "Arm him with a sword in the right hand and with a message of peace in the left and let him go from Lahore to achieve victory for you and pray that God may grant him success".

(12) Syed Zakir Ali Sahed (U.P.) supported the resolution and referred to the "atrocities" which were perpetrated upon them in the Congress-governed provinces.

(13) Begum Saheba Maulana Mohammad Ali appealed to the Muslims to have patience and remain unperturbed specially under the present difficult circumstances when unity in their ranks was their greatest necessity. She was glad to be able to say that Muslim women had been given an opportunity to work in the political field. She felt inclined to say that men could not do anything without the help of women.

Concluding, she said, "We may be lesser in number but we are greater in strength and our spirits remain undeterred and Muslim women of India will fight shoulder to shoulder with their men for the achievement of the goal which has been laid down by this resolution".

(14) Maulana Abdul Hamid Sahed Qadri,(U.P.), supported the resolution.

Mr. M. A. Jinnah, the President of the League, put the resolution to vote which was declared carried unanimously amidst loud cheers.

www.pathagar.com

1946

Resolution passed at the Convention of over 470 Muslim members of the Central and Provincial Assemblies held at Delhi on 8th and 9th April, 1946, with Quaid-e-Azam in the Chair.

'Whereas in this vast sub-continent of India a hundred million Muslims are the adherents of a faith which regulates every department of their life (educational, social, economic and plitical), whose code is not confined merely to spiritual doctrines and tenets or rituals and ceremonies, and which stands in sharp contrast to the exclusive nature of Hindu Dharma and philosophy,. whicn has fostered and maintained for thousands of years a rigid caste system resulting in the degradation of 60 million human beings to the position of untouchables, creation of unnatural barriers between man and man and super-imposition of social and economic inequalities on a large boby of the people of this country, and which threatens to reduce Muslims, Christians and other minorities to the status of irredeemable helots, socially and economically;

"Whereas the Hindu caste system is a direct negation of nationalism, equality, democracy and all the noble ideals that Islam stands for;

"Whereas different historical backgrounds, traditions, cultures, social and economic orders of the Hindus and Muslims have made impossible the evolution of a single Indian nation inspired by common aspirations and ideals; and whereas after centuries they still remain two distinct major nations;

"Whereas soon after the introduction by the British of the policy of setting up political institutions in India on the lines of Western democracies based on majority rule, which meant that the majority of one nation or society could impose its will on the majority of the other nation or society in spite of their opposition, as was amply demonstrated during the two and a

www.pathagar.com

half years' regime of Congress Governments in the Hindu majority provinces under the Government of India Act, 1935, when the Muslims were subjected to untold harassment and opposition as a result of which they were convinced of the futilityand ineffectiveness of the so-called safeguards provided in the constitution and in the Instrument of Instructions to the Governors and were driven to the irresistible conclusion that in a United Indian Federation, if established, the Muslims even in majority provinces would meet with no better fate, and their rights and interests could never be adequately protected against the perpetual Hindu majority at the Centre.

"Whereas the Muslims are convinced that with a view to saving Muslim India from the domination of the Hindus, and in order to afford them full scope to develop themselves according to their genius, it is necessary to constitute a sovereign independent State comprising Bengal and Assam in the northeast zone and the Punjab, the North-West Frontier Province, Sind and Baluchistan in the north-west zone.

"This convention of the Muslim League Legislators of India, Central and Provincial, after careful consideration hereby declares that the Muslim nation will never submit to any constitution for a united India and will never participate in any single constitution-making machinery set up for the purpose, and that any formula devised by the British Government for transfering power from the British to the peoples of India, which does not conform to the following just, equitable principles, calculated to maintain internal peace and solution of the Indian problem:

Pakistan Zones

"First, that the zones comprising Bengal and Assam in the north-east and the Punjab, the North-West Frontier Province, Sind and Baluchistan in the north-west of India, namely,

www.pathagar.com

Pakistan zones where the Muslims are a dominant majority be constituted into a sovereign independent State and that an unequivocal undertaking be given to implement the establisment of Pakistan without delay.

"Second, that two separate consttution-making bodies be set up by peoples of Pakistan and Hindustan for the purpose of framing their respective constitutions.

"Third , that the minorities in Pakistan and Hindustan be provided with safeguards on the lines of the All-India Muslim League resolution passed on March 23, 1940, at Lahore.

"Fourth, that the acceptance of the Muslim League demand of Pakistan and its implementation without delay are the sine qua non for the Muslim League co-operation and participation in the formation of an interim Government at the Centre.

"This convention further emphatically declares that any attempt to impose a constitution on a united India basis or to force any interim arrangement at the Centre contrary to the Muslim League demand will leave the Muslims no alternative but to resist such imposition by all possible means for their survival and national existence."

Proposed by Mr. H.S. Suhrawardy, the Premier of Bengal, and seconded by (1) Malik Feroz Khan Noon, (2) Sardar Shaukat Hayat Khan, (3) Raja Ghazanfar Ali Khan, (4) Begum Shahnawaz, (5) Mr. Abul Hashem, (6) Mr. Abdul Hamid

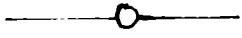

www.pathagar.com

www.pathagar.com